গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য ও
সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছর
(১৯৯৬-২০০১)

গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

তথ্য ও গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

তথ্য ও গবেষণা বিভাগের প্রকাশনা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০১
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০০৪

সম্পাদনা পরিষদ
আবুল মাল আবদুল মুহিত
শেখর দত্ত
নূহ-উল-আলম লেনিন

সম্পাদক ও প্রকাশক
নূহ-উল-আলম লেনিন
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রচ্ছদ
শাহরীয়ার রাসেল

অক্ষর বিন্যাস
তথ্য ও গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

মূল্য
দশ টাকা

উ • ৎ • স • র্গ

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম
এবং
দেশগড়ার কাজে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন
নানাভাবে অবদান রেখেছেন
তাঁদের উদ্দেশে

ভূমিকা

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে 'জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্য : গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর' পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই বর্ধিত সংস্করণের নাম কিছুটা পবির্তন করে 'জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছর : গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত' রাখা হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকারের (১৯৯৬-২০০১) উন্নয়ন ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকাটি তখনই অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্যে সাধারণ মানুষ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মনোযোগ সহকারে পুস্তিকাটি পাঠ করার অবকাশ পাননি। ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের অতুলনীয় বিপুল সাফল্য ভালোভাবে প্রচারিত হয়নি এবং এ-ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্যক ধারণার ঘাটতি থেকে যায়। গত তিন বছরে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের প্রায় সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পটভূমিতে জনগণ এখন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যগুলো নতুন করে খতিয়ে দেখছে। দেশবাসী স্বভাবতই দুই সরকারের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক বিচার করছে। তারা দেখতে পাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সৃষ্ট একটি অমিত সম্ভাবনার দেশকে জোট সরকার কীভাবে আবার অতল অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

জনগণের এই স্বাধীন বিচার বিবেচনাকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যগুলোর একটি বস্তুনিষ্ঠ সামগ্রিক চিত্র পুনরায় দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রথম সংস্করণে তথ্য-উপাত্তের অনেক ঘাটতি ছিল। বর্তমান সংস্করণে সংক্ষিপ্ত হলেও যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য আমাদের প্রায় সকল তথ্য-উপাত্তের উৎস সরকারের বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা (অর্থ মন্ত্রণালয়), পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রতিবেদন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের অভিমত এবং মূল্যায়নও পুস্তক রচনায় আমাদের সহায়ক হয়েছে। সর্বোপরি, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেবল দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েই নয়, পুস্তিকার খসড়াটি একাধিকবার পাঠ এবং প্রয়োজনীয় প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করে এটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পুস্তিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার প্রথম শাসনামলের (১৯৯১-'৯৫) সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকারের আমলের (১৯৯৬-২০০১) তুলনামূলক চিত্র হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনো তুলনা করা হয়নি। আশা করি সচেতন পাঠক ও কর্মীদের কাছে পুস্তিকাটি সমাদৃত হবে।

নূহ-উল-আলম লেনিন
সম্পাদক

অমিত সম্ভাবনার দেশ– প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। দীর্ঘ প্রায় সোয়া দুশো বছরের পরাধীনতা এবং ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ছিল এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালি জাতির সম্ভাবনার প্রধান বাধাটি অপসারিত করেছিল। খুলে দিয়েছিল পশ্চাৎপদতা, অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সদর দরোজাটি। শুরু হয়েছিল অন্ধকার থেকে আলোর পানে অভিযাত্রা।

১.১ স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের প্রাথমিক ও দুরূহ কাজটি প্রায় সম্পন্ন করে এনেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। কিন্তু বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য তিনি বেশি সময় পাননি। জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ রচনার কাজটি শুরু করতে-না-করতেই ইতিহাস থমকে দাঁড়ায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সূচিত হয় উল্টোরথের যাত্রা। দীর্ঘ ২১ বছরব্যাপী জাতির বুকে চেপে বসে সামরিক-অসামরিক নানা পোশাকের হিংস্র স্বৈরশাসন। স্বৈরতন্ত্র কেবল লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা যেমন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে উঠতে দেয়নি, তেমনি সীমিত সম্পদের এই দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাময় সুযোগগুলো নসাৎ করে দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের কপালে দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার কলঙ্ক চিহ্নটি আজও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

১.২ এই দৃশ্যপটের পরিবর্তন সূচিত হয় ১৯৯৬ সালে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এক বিজয়ী গণআন্দোলনের পটভূমিতে ওই একই বছরের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশ সেবার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী, বিচক্ষণ ও গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-এর ২৩ জুন থেকে ২০০১ সালের ১২ জুলাই পর্যন্ত) পাঁচটি বছর রাষ্ট্র পরিচালনায় স্থাপন করেছে অভূতপূর্ব সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শুরু হয় অর্থনৈতিক মুক্তি ও দেশ গড়ার নবতর সংগ্রাম। একটি আধুনিক যুগোপযোগী ও পরিকল্পিত উন্নয়ন-কৌশলের ভিত্তিতে সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে প্রণীত ২১ দফা কর্মসূচি সংবলিত নির্বাচনী ইশতেহার এবং ১৯৯২ সালে প্রণীত অর্থনৈতিক নীতিমালাকে সামনে রেখেই উল্লিখিত পাঁচটি বছর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এই স্বল্প সময়ের পরিসরে অতীতের জমে ওঠা সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলেও, আওয়ামী লীগ চেষ্টা করেছে পশ্চাৎগামী উল্টোরথের রশি টেনে ধরতে। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। জাতির মনে সঞ্চারিত হয়েছিল নতুন আশাবাদ।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছিল হত-দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। অচলায়তনের অর্গল খুলে গিয়েছিল। অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করেছিল সম্মুখ পানে।

আওয়ামী লীগ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যেসব প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা-সংকটের মুখোমুখি হয়, সেগুলো হলো––

১.৩ ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারকে মোকাবিলা করতে হয় অতীতের অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা থেকে উৎসারিত নানা অর্থনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি। এর মধ্যে অত্যন্ত প্রকট ছিল কৃষিখাতের বন্ধ্যত্ব, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের বিধ্বস্ত অবস্থা, স্থবির অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বিনিয়োগ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতির সর্বব্যাপী বিস্তার, সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্বেগজনক অব্যাহত নিম্নগামীতা।

১.৪ বলা বাহুল্য, এসব সমস্যার রাতারাতি সমাধানের কোনো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আওয়ামী লীগের হাতে ছিল না। ছিল বটে তাদের অঙ্গীকারের দৃঢ়তা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মহত্তম ঐশ্বর্যশালী উত্তরাধিকার। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতি জীবন দিয়ে জীবন জয়ের যে শিক্ষা পেয়েছিল, মানুষের জন্য মানুষের সহমর্মিতার যে অনুপম প্রকাশ ঘটেছিল, সর্বোপরি যে অতুলনীয় দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহস জাগিয়েছিল, আওয়ামী লীগের কাছে তা-ই ছিল সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা ও মূলধন। মুক্তিযুদ্ধের ঐ চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারলে যে-কোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। সমস্যা-সংকটের মুখে ভীত-বিহ্বল না হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাঁচটি বছর ধরে চেষ্টা করেছে সংকটজাল ছিন্ন করে দেশকে উন্নয়নের গতিপথে ফিরিয়ে আনতে।

১.৫ ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি ছিল––

- গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান;
- আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা;
- সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় দ্রুত শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা;
- দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- দারিদ্র্য-নিরসন-প্রক্রিয়ার গতি আনয়ন;
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ;
- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন;
- শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন;
- পরিবেশ-সহায়ক উন্নয়ন;

- দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং
- দ্রুত গণমুখী সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দেয়া;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান;
- ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টনসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান এবং
- অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী সম্পর্কের উন্নয়ন ও বাংলাদেশের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার।

রাজনৈতিক উদ্যোগ : গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জিত সাফল্য

২.১ **ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা :** আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশবাসীর গৌরবোজ্জ্বল বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ একই বছরের ১২ জুনের নির্বাচনে জনগণ অবাধে নিজেদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের শাসনামলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচনসহ সকল পর্যায়ে জনগণ নির্ভয়ে ও অবাধে তাদের পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে।

২.২ **স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা :** রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক-সমতা, ন্যায় বিচার ও শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠনের সংগ্রামে ব্রতী হয়।

২.৩ **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :** বিএনপির মতো কোনো দলীয় রাষ্ট্রপতি না করে নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল। গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় সর্বপ্রথম এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আওয়ামী লীগ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল।

২.৪ **সংসদীয় কার্যক্রম :** গণতন্ত্র লাভ করছিল প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নিশ্চিত করা হয়েছিল সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর বদলে সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান করা, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু এবং সংসদ চলাকালে পুরো সংসদীয় কার্যক্রম বেতারে সম্প্রচার করা বাংলাদেশের

সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আওয়ামী লীগের শাসনামলে সংসদে যেসব আইন পাশ করা হয়, তাতে স্বৈরতান্ত্রিক অধ্যাদেশের কোনো স্থান ছিল না। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং কথা বলার জন্য সংসদে সরকারি দলের চেয়ে বেশি সময় পাওয়া সত্ত্বেও বিএনপি, জাতীয় পার্টি দীর্ঘ দুই বছর সংসদ বর্জন করে। বস্তুত সংসদীয় ব্যবস্থাকে অকার্যকর প্রমাণিত করাই ছিল তাদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু তাদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সাফল্যের সঙ্গে তার মেয়াদ পূর্ণ করে।

২.৫ **সমঝোতা ও ঐকমত্য :** নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতীয় ঐকমত্য ও সমঝোতার নীতি অনুসরণের চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ অন্যান্য দল থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করে। বিরোধী দলের অসহযোগিতা ও সরকার উৎখাতের চেষ্টা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এই নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসেনি।

২.৬ **আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা :** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল আওয়ামী লীগের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। ক্ষমতাসীন হবার অল্পদিনের মধ্যেই কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে আওয়ামী লীগ জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করে। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যা বিচারের বাধা অপসারিত হয়। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় ঘোষিত হয়েছে; ঐ রায়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জেল হত্যাসহ অন্যান্য হত্যার বিচার-প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

২.৭ **ইতিহাস-বিকৃতি রোধ :** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তকে এবং রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এভাবে গ্রহণ করা হয় ইতিহাস বিকৃতির অপপ্রয়াসের ধারা অবসানের পদক্ষেপ।

২.৮ **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল। এই প্রথম কার্যকর করা হয় সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ। বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বরাদ্দের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বাধীনভাবে সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করাসহ সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়। বিচার ত্বরান্বিত ও ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই গঠন করা হয়েছিল একটি স্থায়ী আইন কমিশন। আইনের যুগোপযোগী সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন নতুন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশনের সুপারিশও কার্যকর করেছে। এছাড়া গরিব ও দুস্থ বিচার প্রার্থীদের সহায়তার জন্য জেলা জজের নেতৃত্বে আইন সহায়তা কমিটি গঠন,

স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটান সেশন আদালত স্থাপন এবং গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.৯ **স্থানীয় সরকার :** ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের ক্ষমতায়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। সংসদে পাস করা হয় গ্রাম পরিষদ, উপজেলা ও জেলা পরিষদসমূহের কাঠামো, ক্ষমতা ও নির্বাচন পদ্ধতি সংবলিত ভিন্ন ভিন্ন আইন।

২.১০ **সংবাদপত্র, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা :** বাক-ব্যক্তি ও মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতার পাশাপাশি সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমসমূহ ভোগ করেছে পূর্ণ স্বাধীনতা। নিশ্চিত করা হয়েছিল অবাধ তথ্য-প্রবাহ। সংবাদপত্রে সরকারি মালিকানা লোপ করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানায় টেরিস্ট্রিয়াল ও একাধিক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল চালু এবং বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছিল আইন।

২.১১ **প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি :** দলীয় প্রভাবমুক্ত একটি সৎ, দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছিল প্রশাসন সংস্কার কমিশন। এই লক্ষ্যে গঠিত কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছিল। বিএনপি আমলের ভেঙে পড়া প্রশাসনের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণে আওয়ামী লীগ তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'বেতন কমিশন' গঠন ও তার সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে, তাদের বেতন-ভাতাও বৃদ্ধি করা হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসন করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন যোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য স্তরের কর্মচারীদেরও যথাযোগ্য পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল।

২.১২ **গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি :** অতীতের সরকারগুলো, বিশেষত, বিএনপি ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সমাধানে কেবল ব্যর্থই হয়নি, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যার প্রশ্নটি উত্থাপন করতেই ভুলে গিয়েছিল। অথচ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র ৬ মাসের মধ্যে, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের ত্রিশ বছর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের ফলে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের মরুকরণ-প্রক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোতে লবণাক্ততা দূর হয়েছে এবং জি-কে প্রজেক্টভুক্ত এলাকায় বন্ধ-হয়ে-যাওয়া সেচ প্রকল্পগুলো পর্যাপ্ত পানি পেয়ে শস্য শ্যামলা হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দেশের পানি

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পানি নীতি।

২.১৩ **পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা :** ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদন আওয়ামী লীগ সরকারের এক ঐতিহাসিক সাফল্য। দেশের এক-দশমাংশ জুড়ে দীর্ঘ দুই দশকের যুদ্ধাবস্থার অবসান ও ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি বন্ধ হয়, সংরক্ষিত হয় পাহাড়ি ও বাঙালিদের ন্যায্য স্বার্থ। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী ৬৫ হাজার উপজাতীয় শরণার্থী দেশে ফিরে আসে। স্বদেশ প্রত্যাগত শরণার্থী ও অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা শান্তি বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগত সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সারা বিশ্বে স্থাপন করেছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিএনপি-জামাত জোট এই চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের এক-দশমাংশ ভারতের দখলে চলে যাবে বলে অপপ্রচার চালায় এবং সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয় এবং তার বাস্তবায়ন শুরু করে।

২.১৪ **অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল :** অর্পিত সম্পত্তি আইন (শত্রু সম্পত্তি) বাতিল করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি শাসকদের প্রবর্তিত দেশবাসীকে বিভক্তকারী মানবাধিকার-বিরোধী এই বৈষম্যমূলক আইন রহিত করে আওয়ামী লীগ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছিল।

২.১৫ **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস :** মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল বলেই ভাষা শহীদদের আত্মদানে ভাস্বর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে উত্থাপিত বাংলাদেশের এই প্রস্তাব ১৮৮টি দেশ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রায় ৪ হাজার ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষ যথাযোগ্য মর্যাদায় এই দিবসটি পালন করে আসছে। আওয়ামী লীগ সরকারের একান্ত উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্বে বাঙালি জাতিকে নতুন গৌরবে অভিষিক্ত করেছে। এই উদ্যোগে কানাডা প্রবাসী মাতৃভাষা প্রেমী বাঙালি সম্প্রদায় দিশারীর ভূমিকা পালন করে বাঙালি জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

২.১৬ **শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলা :** ১৯৯৭ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং দেশব্যাপী বন্যা, ১৯৯৮ সালের শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১১টি জেলায় ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম আকস্মিক ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য দেশবাসী ও বিশ্ব-সম্প্রদায়ের বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে। ১৯৯৮ সালে দেশের ৫৩টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিধ্বংসী বন্যায় কৃষিখাতে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকাসহ শিল্প ও অবকাঠামোগত খাতে মোট ১০,২২৮

কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়। ২৬ লক্ষ ঘরবাড়ি, ২৪ হাজার কিলোমিটার রাস্তা, ১৭৬৪ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ৩৭ হাজারেরও বেশি কালভার্ট ও সেতুসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা প্রভৃতি অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। দুই কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে বলে বিরোধী দল প্রচার করেছিল। কিন্তু সরকার ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে ৯ মাসব্যাপী ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য সাহায্য দেয়। ফলে একজন মানুষও খাদ্যের অভাবে মারা যায়নি। বিরোধী দলের প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ আদায় স্থগিত রেখে কৃষক ভাইদের বর্ধিত হারে নতুন করে ৩,২৭০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। সততা, দক্ষতা ও সুপরিকল্পিতভাবে বন্যা মোকাবিলা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে এই প্রলয়ঙ্করী বন্যার পরও খাদ্যশস্যের বাম্পার ফলন ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জিত হয়। দেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে এবং ২০০০ সালের বন্যার পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। এতে দুর্যোগ মোকাবিলায় কেবল দক্ষতাই নয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্যও প্রমাণিত হয়।

২.১৭ **নারীর ক্ষমতায়ন :** নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে আওয়ামী লীগের সাফল্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করে। নারীর ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। এই প্রথম ব্যক্তির পরিচয়ের ক্ষেত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নামের উল্লেখ থাকাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রায় ৪৫ হাজার মহিলা অংশগ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে সরাসরি নির্বাচিত হন। সরকারি উচ্চপদে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগ্য মহিলাদের পদোন্নতি ও নিয়োগ দান করা হয়। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি, সচিব, জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের উচ্চপদে মহিলারা নিয়োগ লাভ করেন। এছাড়া সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে মেয়েদের নিয়োগ, নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বয়োবৃদ্ধ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দু'লক্ষ মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে কঠোরতর আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিশেষ উলেখযোগ্য পদক্ষেপ। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির সংবিধান সংশোধনী বিল আওয়ামী লীগ উত্থাপন করে। কিন্তু বিরোধীদল বিএনপির সংসদ বর্জন ও অসহযোগিতার জন্য এই বিল পাস করা সম্ভব হয়নি।

২.১৮ **প্রতিরক্ষা :** অতীতে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও একনায়করা জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা, অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং দেশবাসীকে দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনামলে সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী ও শক্তিশালী আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সঙ্গে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারদের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের খাদ্য তালিকায় দুই বেলা ভাতের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া তাদের বেতন ভাতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনীর জন্য সর্বাধুনিক মিগ-২৯ জঙ্গি বিমান ক্রয়, নৌ বাহিনীর জন্য দেশে এই প্রথম সর্বাধুনিক বিমান সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ 'বঙ্গবন্ধু' এবং পদাতিক বাহিনীর জন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম যুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী মেডিকেল কলেজ ও ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।

বিডিআর-কে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে উপযোগী করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিডিআর-এর সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে পর্যায়ক্রমে ২২ হাজার জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় মোতায়েনের জন্য মোট ৬ ধাপে একটি সীমান্ত সদরসহ ৪টি সেক্টর, ২০ রাইফেল ব্যাটালিয়ান ও একটি রিভারাইন ব্যাটালিয়ান প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিডিআর সদস্যরা কর্তব্যরত অবস্থায় আহত বা নিহত হলে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দ্বিগুণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস পদকের মূল্যমান ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকায় এবং প্রেসিডেন্ট রাইফেলস পদকের মূল্যমান ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

২.১৯ **পররাষ্ট্র নীতি :** পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কেবল সফলই হয়নি, দেশকে বিশ্বসভায় অধিষ্ঠিত করেছে এক গৌরবের আসনে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, দেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা, দুটি দেশের মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস ও ট্রেন যোগাযোগ চালুসহ অন্যান্য অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে অর্জিত অগ্রগতি আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যেরই

পরিচায়ক। সার্কভুক্ত অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ বহুমুখী সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে পারস্পরিক লাভজনক সম্পর্ক। ডি-৮, বিমসটেক প্রভৃতি আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ পালন করেছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। এছাড়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য নির্বাচিত হওয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা বাংলাদেশকে নতুন করে মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অতীতের আপাত বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং নতুন এক সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও-এর সেরেস পদক লাভ এবং ২০০০ সালের এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি অর্জন, সর্বোপরি, মেয়াদান্তে সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও ইতালিতে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে স্বল্পোন্নত বিশ্বের এশীয় অঞ্চলের মুখপাত্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রধানের মর্যাদায় অংশগ্রহণ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিশ্বসভায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের এক নতুন ইমেজ– আত্মমর্যাদাশীল জাতির অমিত সম্ভাবনার নতুন পরিচয়।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্য : সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন

৩.১ সমস্যা-সংকটের দুর্ভার উত্তরাধিকার নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও মাত্র পাঁচ বছরে বাংলাদেশ তার নেতিবাচক ভাবমূর্তি কাটিয়ে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড পরিশ্রমী, বিজ্ঞানমনস্ক, হত-দরিদ্র মানুষের মুক্তি সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও তথ্য-প্রযুক্তি হিতৈষী একজন আধুনিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ভিত রচনা করতে সক্ষম হন।

পশ্চিমের অনেক উন্নয়ন-বিশারদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তা ব্যক্তিরা মনে করতেন, বাংলাদেশ নামের দেশটির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। 'উন্নয়নের বৈতরণী' কোনো দিনই এই দেশ পার হতে পারবে না। নিমজ্জমান এই জাহাজের হাল ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। উন্নয়ন-বিশারদদের এই ভবিষ্যদ্বাণী আওয়ামী লীগ মিথ্যা প্রমাণিত করে। তবে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না এই পথ চলা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'মিরাকল' বা আশ্চর্য অর্থনীতি যখন মন্দা কবলিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির কারণে যখন এক কোটি মানুষ মারা যাবে বলে আন্তর্জাতিক সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর মনেও শংকার সৃষ্টি হয়েছিল এবং বিশ্ব অর্থনীতিতেও যখন মন্দা চলছিল, আর ঠিক ওই রকম সময়েই বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির দৌড়ে অগ্রসরমান দশটি উন্নয়নশীল দেশের একটিতে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে একদা যে 'আন্তর্জাতিক মুরব্বীরা' বাংলাদেশকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তারাই পরে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের মূল্যায়ন সঠিক নয়, বাংলাদেশ তার দুর্নাম ঘুচিয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন : সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

৩.২ দারিদ্র্য বিমোচন ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচন পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি হয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙে সংবিধানে বর্ণিত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো ক্রমান্বয়ে পূরণের লক্ষ্য থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার গতানুগতিক কর্মসূচির বাইরেও দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমুখী উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। দারিদ্র্যের লজ্জাকর উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল সকল কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। এর ফলে–

- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৫৩ শতাংশ দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করতো, আওয়ামী লীগ আমলে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বার্ষিক ১ শতাংশ হারে।

অনপেক্ষ দারিদ্র্য : ১৯৯১-২০০০

লেখচিত্র : ১

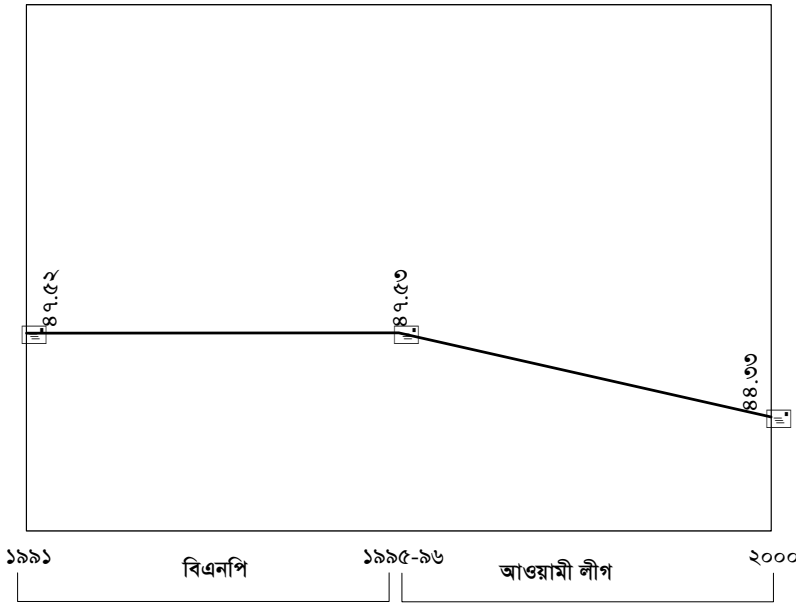

- এপ্রিল ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সময়-পরিসরে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে ২২০৬.১ কিলো ক্যালরি থেকে ২২৭৪.২ কিলো ক্যালরিতে এবং শহরাঞ্চলে ২২২০.২ কিলো ক্যালরি থেকে ২২৮৮.৩ কিলো ক্যালরিতে উন্নীত হয়েছিল।
- মানব দারিদ্র্যসূচক বিএনপি আমলের ৪২ শতাংশ থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩৪ শতাংশে নেমে আসে।
- বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ু (জন্মলগ্নে) ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৫৮.৭ বছর থেকে ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় পুরুষ ৬২ বছর এবং মহিলা ৬৩ বছর।
- মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৫-৯৭-এর ৪২.৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সময়-পরিসরে ৪৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

৩.৩ **ক. দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা**

- দেশের ইতিহাসে এই প্রথম বয়স্ক ভাতার প্রচলন করে শেখ হাসিনার সরকার। প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জন (এর মধ্যে ৫ জন মহিলা) হিসেবে সারা দেশে মোট ৭ লাখ বয়োজ্যেষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে মাসিক একশত টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়।
- সারাদেশের ৭ লাখ দরিদ্রতম বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের মাসিক ১০০ টাকা হারে নিয়মিত ভাতা প্রদান আওয়ামী লীগ আমলেই শুরু হয়।

খ. দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি

- অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের মধ্যে ৪৬১টি উপজেলায় ৪৪৭৯টি ইউনিয়নে ২,৩৬,৫৯৫ জন অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা মাসিক একশত টাকা হারে ভাতা পাচ্ছেন। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য কোনো দেশে এর দৃষ্টান্ত নেই।

গ. প্রতিবন্ধীদের জন্য

- প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক অনুদান নিয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হয়। প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র প্রদান করে সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঘ. গৃহায়ণ তহবিল

- গৃহায়ণ প্রকল্পের অধীনে মোট ২,২০০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল অথবা নির্মাণাধীন ছিল। এর ফলে ১ লাখ ২২ হাজার মানুষ উপকৃত হয়।
- ২৯ হাজার হতদরিদ্র গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়। আরো ১৮০০০ গৃহ নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেয়া হয়েছিল।
- এদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৭.২ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয়।
- যাদের ভিটে আছে অথচ উপযুক্ত ঘর নেই, তাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ৩৩ হাজার পরিবারের গৃহ নির্মাণের জন্য

৬৬ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ১৮৫০০ গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল।

ঙ. দরিদ্র ও অসহায় বয়স্কদের আবাসনের জন্য

- ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি শান্তি নিবাস স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। এতে ১০০ জন অসহায় ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষ বসবাস করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ৬০ জন মহিলা ও ৪০ জন পুরুষ।
- ঐসব শান্তি নিবাসে খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা ও বিনোদন ব্যবস্থাসহ বয়স্কদের সুস্থ থাকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রাখা হয়।
- ৬টি শান্তি নিবাসে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

চ. আশ্রয়ণ প্রকল্প : গৃহহীনদের গৃহদান ও আত্মকর্মসংস্থান

- ৫ বছরে (৯৭/৯৮-২০০১/২০০২) ৫০,০০০টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয় দেয়া হয়। বছরে প্রায় ১০,০০০ পরিবারের জন্য প্রায় ১০০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়।
- এই প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ পরিবারকে কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- ৫০,০০০ পরিবারকে ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। গড়ে ঋণের পরিমাণ ছিল পরিবার পিছু ১০,০০০ টাকা।
- এই প্রকল্পের উল্লিখিত পাঁচ বছরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা।

ছ. শহরের বস্তি থেকে ঘরে ফেরা কার্যক্রম

- ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহীদের জন্য ঘরে ফেরা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০০০ সাল পর্যন্ত ১৪ হাজার ২২০ জন বস্তিবাসী পরিবারকে ৫ কোটি টাকা প্রদান করে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়।
- আরো ১০,০০০ বস্তিবাসীকে ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় আনার ব্যাপারটি প্রক্রিয়াধীন ছিল।

জ. একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি

- কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনার লক্ষ্যে কৃষক সমাজকে সহায়তাকল্পে প্রত্যেক কৃষকের বাড়িকে একটি আদর্শ খামারে রূপান্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির প্রতি আহ্বান জানান। এটি ছিল একটি চমৎকার প্রণোদনামূলক কর্মসূচি। ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, ফলজ বৃক্ষরোপণ এবং পরিবেশসম্মত বসতবাড়ির আঙিনা রচনায় ও পারিবারিক পুষ্টির সমস্যা দূরীকরণে, আয় বর্ধনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি প্রভূত অবদান রাখে।

- ১৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
- ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ১০ লাখ লোক উপকৃত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

ঝ. কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন : ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

- দেশের বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে।
- এ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত ৪৬১ জন বেকার যুবক ও যুব মহিলার মধ্যে ৪১ কোটি ৩ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ১৪টি মন্ত্রণালয়ের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসমূহে ৩৪৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ পুঞ্জীভূত ভিত্তিতে ৭০০৫ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে।

ঞ. আদর্শ গ্রাম স্থাপন কার্যক্রম

- সরকার প্রথম পর্যায়ে ৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ৮০টি আদর্শ গ্রাম স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৪৬ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চালিয়ে যায়।
- পাঁচ বছরে ২৮ হাজার ১৫৬টি ভূমিহীন পরিবারকে ৪৬৩টি আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে ১৮.১ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করা হয়।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ পুঞ্জীভূত ভিত্তিতে ১ কোটি ২ লাখ ঋণ গ্রহীতার কাছে ১০,৯০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে।

ট. দারিদ্র্য দূরীকরণে খাদ্য কর্মসূচি

- সরকার ১৯৯৮/৯৯ অর্থবছরে ৪২ লাখ ৫০ হাজার দুস্থ পরিবারকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৯ মাস ধরে প্রায় ৫৮৫ কোটি টাকার খাদ্য সাহায্য দেয়। একইভাবে ১৯৯৯/২০০০ সালে ২৩.৫৭ লক্ষ পরিবারকে তিন মাসের জন্য এবং ৪২.১৬ লক্ষ পরিবারকে দু মাসের জন্য খাদ্য সাহায্য দেয়া হয়।
- প্রতি বছর গড়ে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় ১২.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন করে।

আওয়ামী লীগ সরকার আমলের দারিদ্র্য-বিমোচন সংক্রান্ত কর্মসূচির ধরন, সংশিষ্ট খাত/সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির একটি বিস্তারিত ছকপত্র মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হলো।

দারিদ্র্য নিরসন : পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর্মসূচি

কর্মসূচির ধরণ	সংশ্লিষ্ট খাত / সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি		দৃষ্টি আকর্ষণ
(ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন	● শিক্ষা ● স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ● নারী ও শিশু উন্নয়ন	● যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন ● সমাজ কল্যাণ ● সাংস্কৃতিক	এ খাতগুলোর প্রায় সব বরাদ্দই মানব উন্নয়নে হয়ে থাকে। বিশেষত এসবের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে মানব উন্নয়নের ওপর গিয়ে পড়ে।
(খ) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ১. প্রধান খাতসমূহের সাধারণ কর্মসূচি	● কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ, প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি খাতের বিভিন্ন প্রকল্প।		মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি এ খাতগুলোর প্রকল্পসমূহ পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ অবদান রাখে। বিশেষত দুর্বল জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এসবের স্বল্পমেয়াদি অবদান লক্ষ্য করা যায়।
২. নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি	● কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ● খয়রাতি সাহায্য (জি আর) ● কাজের বিনিময়ে খাদ্য সাহায্য (টি আর) ● দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও উন্নয়ন (ভিজিএফ ও ভিজিডি) ● স্কুল ফিডিং ইত্যাদি		
৩. বিশেষ কর্মসূচি	● বয়স্ক দরিদ্র্যদের জন্য বয়স্ক ভাতা ● গৃহহীন দরিদ্রদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ণ তহবিল ● দুস্থ মহিলা ভাতা ● দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহায়ণ কর্মসূচি ● আশ্রয়ণ প্রকল্প		হত দরিদ্রদের জন্য নেয়া এসব কর্মসূচি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম। সমাজে এসবের ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।
৪. উন্নয়ন কর্মসূচি	● আদর্শ গ্রাম ● শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ● পশু সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ● দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ ● সামাজিক ক্ষমতায়ন ● পল্লী বিদ্যুতায়ন ● গ্রামীণ স্যানিটেশন ● উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ● মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান ● মসজিদভিত্তিক দারিদ্র্য-বিমোচন ● পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ ● সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম ● দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ● যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান ● কর্মসংস্থান ব্যাংক		গ্রামীণ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে এসব কর্মসূচির অবদান লক্ষ্য করা যায়।

৫. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ	• স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) • বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) • বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বিএআরডি)	সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে
৬. ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	• বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও) • গ্রামীণ ব্যাংক • পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) • বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) • রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এনসিবি) • প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি : প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ইত্যাদি।	সরকার এসব কর্মসূচির সমন্বয় করে থাকেন। এসব কর্মসূচির সরাসরি প্রভাব দরিদ্রজনদের ওপর পড়ছে। এগুলো না থাকলে আরো বহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় করত।
৭. অন্যান্য	• মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ • অসহায় ও বয়োবৃদ্ধদের আশ্রয় ও শুশ্রূষার জন্য শান্তির নিবাস • 'একটি বাড়ি একটি খামার' জাতীয় টেকসই কর্মসূচি • ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ • বিশেষ অর্থ সাহায্য (প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে চিকিৎসা ব্যয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক/ব্যক্তিক/গোষ্ঠিক/ দুর্ঘটনাজনিত এবং অন্যান্য অনির্ধারিত কারণে বিশেষ সাহায্য ইত্যাদি।	• বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে পেয়েছে। • 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচির দারিদ্র্য নিরসনের একটি টেকসই কর্মসূচি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.১ সবার জন্য স্বাস্থ্য : নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম

- সবার জন্য স্বাস্থ্য-- এই কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পদক্ষেপের বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করে নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় পরিবার পরিকল্পনা ও নারী-স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা উদ্যোগ। ১৯৯৮ সালে পাঁচ বছরের জন্য এক যুগান্তকারী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সমুদয় কার্যাবলি ও উদ্যোগকে সমন্বিত করে এই খাতে বিনিয়োগকে গতিশীল ও ফলপ্রসু করে তোলা হয়। যুগান্তকারী এই সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবশ্য নানা ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। তবে তার সমাধানের ব্যবস্থাও নিয়মিত পর্যালোচনা ও সংশোধনের মাধ্যমে তার সমাধানের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল।
- ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৫৮.৭ বছর। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩ বছরে উন্নীত হয়।

- উন্নত চিকিৎসার আশায় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে রোগীদের বিদেশ গমনের প্রবণতা রোধকল্পে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশেই সহজলভ্য করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- বিএনপি সরকারের আমলে ৯৫/৯৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১,৬১১ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০১/২০০২ অর্থবছরে এক্ষেত্রে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৮৭৩.৪ কোটি টাকা।
- দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতি ৬ হাজার নাগরিকের জন্য একটি করে সারা দেশে ১৮,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০০১ সালের জুনের মধ্যে ১০ হাজার ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।
- ১০৮টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১১টি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছিল।
- আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনামলে ৪০০০ নার্সকে নতুন নিয়োগ দেয়।
- ২০০০/২০০১ অর্থবছরে ২ হাজার নতুন ডাক্তার নিয়োগ করা হয় এবং ১১৮২ জন ডাক্তার নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। ৫৫০৫ জন চিকিৎসকের চাকরি স্থায়ী করা হয়।
- বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠিত হয়।
- দেশবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।
- ৫ বছরে ৭০০০টি হাসপাতাল-শয্যা বাড়ানো হয়।
- ৬৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প গৃহীত হয়। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিদ্যমান অপুষ্টি কমিয়ে আনাই ছিল এই কর্মসূচির লক্ষ্য।
- ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এইডস রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল।
- কিডনি রোগ নিরাময়ে একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়।
- হাসপাতালগুলোতে রোগীর দৈনিক বরাদ্দ বাড়িয়ে ২২ টাকার জায়গায় ৩০ টাকা করা হয়।
- ২০০৫ সাল নাগাদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গ্রহণযোগ্য লক্ষ্যমাত্রায় সীমিত করার পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়।
- পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে কর্মরত ৪৪০০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হয়।

৫.১ শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি

- শিক্ষকদের পেশাগত মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ৫টি হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। ৯৮৭৮ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।
- ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৬০২৮ কোটি টাকা। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে অর্থাৎ ৯৫-৯৬ সালে এক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৩৫২২ কোটি টাকা, আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে সেখানে বরাদ্দ ৬৬ শতাংশ বাড়ানো হয়।

৫.২ শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

- বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সরকারি বেতনের ৯০ ভাগ অনুদান দেয়া হতে থাকে। ৫ বছরে এই খাতে ব্যয় দ্বিগুণ করা হয়।
- কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার কোর্স প্রবর্তনের প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার।
- আনুমানিক ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার' নামে একটি অত্যাধুনিক প্ল্যানেটোরিয়াম স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকসমূহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার আমলের শেষ বছরে প্রতিটি থানার একটি বিদ্যালয়ে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১১৯.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। স্থাপিত হয় ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট পূর্বতন খালেদা জিয়ার সরকার বন্ধ করে দেয়। আওয়ামী লীগের সরকার ৫০ কোটি টাকা দিয়ে এই ট্রাস্ট আবারও চালু করে।
- বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবনের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে।
- এসএসসি, এইচএসসি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সকল পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। ফলে দ্রুত ফল প্রকাশ ও সনদপত্র প্রদান করা সম্ভব হয়।
- নকল প্রতিরোধে ১৯৯৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৩ দফা কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল, যার সুফল হাতেনাতে পাওয়া যায়।
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'বঙ্গবন্ধু বৃত্তি' প্রবর্তন করা হয়।

- আগে সকল পরীক্ষায় কোনো-না-কোনো বিষয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের পরীক্ষা বিষয়ক ২৩-দফা কার্যক্রম গ্রহণ করায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ক্রমশ কমে আসার দিকে ছিল।
- ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, সংস্কার এবং পুনর্গঠন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে ৩৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।
- সরকারি ও বেসরকারি নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফ্‌ট চালু ও সম্প্রসারণ করার ফলে ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়।
- নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি মহিলা কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ অগ্রসর করে নেয়ার কাজ শুরু হয়েছিল।
- ১৬টি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজও চলছিল।
- বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার শতকরা ৯০ ভাগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার।
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিক্ষকের ঘাটতি মেটাতে একাধিক বিষয়ের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে দেয়া হয়।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসারের জন্য

- ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত ৭২১৪টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৭১টি সরকারি বিদ্যালয়, ১৭৪১টি বেসরকারি মাদ্রাসা ও ৩টি সরকারি মাদ্রাসা ভবনের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়।
- সারা দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কাজ শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে ৬টির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল।
- চট্টগ্রামে একটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য গাজীপুরে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়।
- বিভাগীয় সদরে তিনটি নতুন মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৫.৪ নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

- আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র ৫ বছরে দেশে সাক্ষরতার হার ৪৪ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হয়।

- আমাদের সরকার ১৪০৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ২ লাখ ৪৭ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়।
- সার্বিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। দেশের ২ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার নিরক্ষর এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাক্ষর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এতে ব্যয় হয় ৬৮২ কোটি ৯৯ লাখ ৬১ হাজার টাকা।
- আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনামলের ৫ বছরে কয়েকটি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করে।

৫.৫ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা দেড় গুণ বৃদ্ধি পায়।
- বিদ্যালয়হীন প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির অধীনে ৬ কোটি নতুন বই বিতরণ করা হয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিশুশ্রম রোধ ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধকল্পে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি জোরদার করা হয়।
- ৪ হাজার স্যাটেলাইট বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের সূচনা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এবং ৩৩ হাজার শিক্ষক উপকৃত হয়।
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

৫.৬ নারী শিক্ষার উন্নয়নে

- নারী শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রায় ৭০০০ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়।
- নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়।
- প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ বছরে ১৮টি জেলা সদরে ১৮টি কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়।
- বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে একটি করে মহিলা কলেজ স্থাপন করা হয়।
- বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ ও ১৫টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ২১.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৫.৭ জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন

- ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের ভিত্তিতে একটি নতুন গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষা নীতি আওয়ামী লীগ সরকার জাতিকে উপহার দেয়।

- ১৩টি নতুন পেশাদারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং প্রতিটি উপজেলায় নির্বাচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের কাজ এগিয়ে নেয়া হতে থাকে। এ দুটি প্রকল্পে ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণে পদক্ষেপ

- আওয়ামী লীগ সরকার পরিবেশ আদালত আইনের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র পরিবেশ আদালত গঠন করে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর ১১৭৬টি তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে।
- সুন্দরবন ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্প গৃহীত হয়।
- বায়ু দূষণ হ্রাসের জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- দেশব্যাপী বনায়ন, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- পানিতে আর্সেনিক দূষণ রোধে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে ৩১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তিনটি প্রকল্প চালু করে।
- পার্বত্য জেলাগুলোতে ৪৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৪০ হেক্টরেরও বেশি জমি অধিগ্রহণ করে বন সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করে।
- আওয়ামী লীগ শাসনামলের দু-বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৯৮ সাল থেকেই দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন-বিশিষ্ট ত্রি-চক্রযান নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ২০০০ সালের শুরুতে ২০০২ সালে এই কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- যানবাহনকে পরিবেশসম্মত করার জন্য সিএনজি-তে রূপান্তরণের কাজ শুরু হয় এবং পুরনো গাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়।
- ১৯৯৯ সালে সীসামুক্ত পেট্রোল সরবরাহ করার ব্যবস্থা চালু করা হয়।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি স্থাপনায় ব্যবস্থা নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং শহরের প্রতি ওয়ার্ড ও প্রতি গ্রামে একটি করে পানীয় জলের পুকুর নির্দিষ্ট করার প্রকল্প গৃহীত হয়।
- জলাধার সংরক্ষণের জন্য আইন করা হয়। নদীর কূলে স্থাপনা নিষিদ্ধ ও নদীবক্ষে দখল বন্ধ করা হয়।
- ঢাকায় ধানমন্ডি হ্রদ সংস্কার করা হয়। গুলশান, বনানী ও উত্তরা হ্রদ সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়।
- ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল নাগাদ পলিথিন নিষিদ্ধকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে উৎসাহিত করার জন্য ১ লক্ষেরও বেশি লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- বৃক্ষ রোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে উৎসাহিত করা হয়।
- উপকূলীয় এলাকা ও চর এলাকায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।
- পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগেও আওয়ামী লীগের প্রভূত অবদান রয়েছে।

৭. নারী ও শিশু উন্নয়ন

- ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু উন্নয়নে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ বরাদ্দ ছিল ৪৫.৬২ কোটি টাকা।
- নারী ও পুরুষের মধ্যকার অসমতা দূরীকরণ ও মহিলা শ্রমের সঠিক স্বীকৃতি প্রদানসহ শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য তারা নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করে :
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনাসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য এবং মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন করে 'জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করা হয়।
- মহিলা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি করে ৩৩৭.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত করে। বিগত সরকারের আমলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪৫ কোটি টাকা।
- ৭টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৭টি প্রকল্পে মহিলাদের প্রত্যক্ষ উন্নয়নের জন্য ১৭৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার উন্নয়ন, মহিলাদের আইনসঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার রোধ, পার্বত্য চট্টগ্রামের মহিলাদের উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচিসহ ৩০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়।
- ময়মনসিংহে বেগম রোকেয়া প্রকল্প চালু করা হয়।
- মহিলা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের নির্যাতিত, আশ্রয়হীন, দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।
- 'শিশু পাচার প্রতিরোধকল্পে সমন্বিত কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা, ফলোআপ এবং তৃণমূল পর্যায়ে মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে WID Co-ordination committee গঠন করা হয়েছে।
- মহিলাদের কৃষি ও অকৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়।
- ঢাকার দুটি এলাকায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়।
- দুস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন ও কল্যাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজের সূচনা করা হয়।
- মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্যোগী ও কর্মঠ মহিলাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কারিগরি দক্ষতা, নেতৃত্বের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- দেশের পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন ভারি ও বিপজ্জনক শ্রম থেকে শিশুদের অবমুক্ত করা হয়।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই জাতির জনকের জন্মদিন ১৭ মার্চকে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
- শিশু পাচার ও শিশুর ওপর নির্যাতন প্রতিরোধে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়।
- শিশু-মৃত্যুর হার ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রতি হাজারে ছিল ৭২ জন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তা কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৫১ জনে।

৮. সমাজকল্যাণ কার্যক্রম

- ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দ ছিল ১০৬.৭২ কোটি টাকা। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এই বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৯ কোটি টাকা।
- সম্প্রসারিত পলী সমাজকর্ম, পলী মাতৃকেন্দ্র ও শহর সমাজসেবা কার্যক্রম–– এই তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে অগ্রসর করে নেয়া হতে থাকে।
- ১৯৭৪ সালে শুরু করা সমাজসেবা কার্যক্রমের পঞ্চম পর্বটি দেশের ৩১১টি থানায় বাস্তবায়ন করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৪৬১টি থানায় প্রায় ২০ লক্ষ পরিবারকে ১১৫ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হয় এবং প্রায় ১১ লক্ষ পরিবারকে দেয়া হয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

- জনসংখ্যা কার্যক্রমে পলী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার প্রকল্পের অধীনে ২০০০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭.৯ লক্ষ গ্রামীণ মহিলাকে ২১.৩৯ কোটি টাকা সুদমুক্ত ঘূর্ণায়মান ঋণ দেয়া হয়।
- এই প্রকল্পের আওতায় ৭.৯১ লক্ষ মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৩টি শহরে কার্যক্রম চালু করা হয়।
- দেশের এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের পারিবারিক পরিবেশে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ৭৩টি শিশু সদন ও শিশু পরিবার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রতি বছর ৯৫০০ জন এতিম ও শিশু উপকৃত হয়।
- আইন করে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয় এবং ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধী মেয়ে এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আরো ৪টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।
- **কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার অব বাংলাদেশ :** সরকারি আর্থিক সাহায্যে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক দরিদ্র রোগীদের জন্য সুলভ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে আধুনিক চিকিৎসা সেবা সুবিধা সংবলিত ১০০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করা হয় এবং ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারি পরিচালনা করা হয়।
- **টানবাজার ও নিমতলীতে বসবাসরত দেহ ব্যবসায় বাধ্য সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের পুনর্বাসন কার্যক্রম :** ১৯৯১ সালের জুলাই থেকে ২০০০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত এই কার্যক্রমের কেন্দ্রে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।
- **সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স :** ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস একই কমপ্লেক্সে স্থাপন করে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকার আগারগাঁওয়ে এই কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।
- **জাতীয় কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠান :** বিভিন্ন অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন কিশোরীদের জেলখানায় না রেখে বাংলাদেশ শিশু আইন ৭৪-এর আওতায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সংশোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংশোধন ও আর্থ-সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।
- **শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্প :** ১৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উন্নত মানের প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করে এর বিক্রয় লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- **শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :** এতিম, দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশুদের লালন-পালন করে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য ৭ কোটি ২১ লাখ টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয় ।
- **বেবি হোম স্থাপন :** খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরে ৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি বেবি হোম নির্মাণের কাজ শুরু হয় ।
- **আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নয়ন :** মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সংশিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে ৫ কোটি ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করার কাজ শুরু হয় ।
- **বান্দরবান জেলায় সরকারি শিশু পরিবার প্রকল্প স্থাপন :** পার্বত্য এলাকার অসহায় এতিম ছেলেমেয়েদের লালন-পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ৪ কোটি ৮৭ লাখ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় ।
- **মুজিব নগর কমপ্লেক্সে সরকারি শিশু পরিবার স্থাপন :** এতিম, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এতিম ছেলেমেয়েদের স্নেহ, ভালোবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৩ কোটি ১১ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।
- **কমিউনিটি বেইজড প্রিভেনশন অভ জুভেনাইল ডেলিকুয়েন্সি :** শিশু-কিশোরদের অপরাধ সম্পর্কে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মা-বাবা ও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য টঙ্গীতে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় ।
- **অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিসোর্সেস ফর ইমপ্রুভিং স্ট্রিটস চিলড্রেন এনভায়রনমেন্ট (এরাইজ) :** রাস্তায় বসবাসরত, পরিত্যক্ত, আশ্রয়হীন ও দুর্দশাগ্রস্ত পথ-শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত ও সুস্থ পরিবেশে বসবাসে সাহায্য করা ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ১৯ কোটি ৪৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ।
- **সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম :** দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩১১টি উপজেলায় কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে পল্লীর দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, বিদ্যালয়-বহির্ভূত কিশোর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয় ।

- **বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধীকৃত এতিমখানার জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট কার্যক্রম :** সারাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত নিবন্ধীকৃত এতিমখানার নিবাসীদের শিক্ষা, খাদ্য, পোশাক ও তাদের চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের জন্য মাথাপিছু ৪০০ টাকা হারে নির্দিষ্ট সংখ্যক এতিমদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করার কাজ শুরু হয়।

সারণি-১ : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সামাজিক খাতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

LvZ	1991/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	2000/01
1. wk¶v I ag	535	651	985	1553	1402	1584	1494	1776	2014	2285
2. µxov I ms¯‹wZ	20	37	55	70	31	60	66	52	112	
3. ¯^v¯’¨ I cwiKíbv	558	630	772	946	893	1079	1166	1256	1469	
4. kg I Rbkw³	11	9	14	15	8	9	10	9	14	
5. mgvRKj¨vY, gwnjv welqK Ges hye Dbqb	39	55	75	134	113	187	156	169	180	
6. Dc-‡gvU (1+2+3+4+5)	1163	1382	1901	2718	2447	2919	2892	3262	3677	4239
7. ‡gvU GwWwc eivÏ	7150	8121	9600	11150	10447	11700	12200	14000	16500	17500
8. mvgvwRK LvZ ‡gvU GwWwc e¨‡qi kZvsk wn‡m‡e (6/8*100)	16.3	17.0	19.8	24.4	23.4	24.9	23.7	23.3	22.3	24.2

উৎস : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সংখ্যাসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

<u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ : ১৯৯১/৯২-২০০০/০১</u>

(বি এন পি-র পাঁচ বছর বনাম আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর)

লেখচিত্র : ২

(কোটি টাকা)

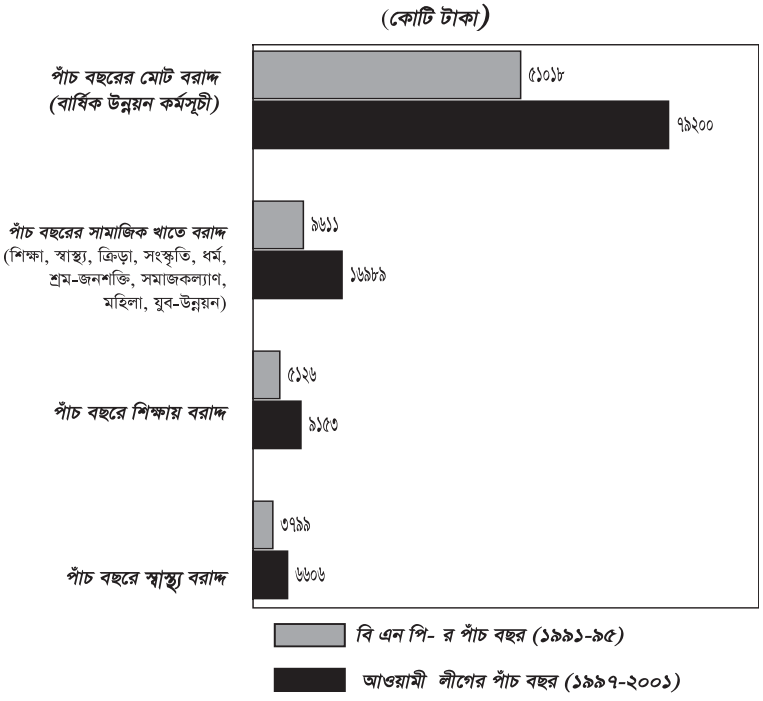

৯. আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন

জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত এবং উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য সমাজ-বিরোধী শক্তি আওয়ামী লীগের শাসনামলে নানা ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতায় মদদ ও উস্কানি দিয়ে চলে। সন্ত্রাস রোধে সরকার বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। আওয়ামী লীগ সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে যাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। এই লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় :

- শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন শ্রেণীর অতিরিক্ত ৫ হাজার নতুন পদ সৃষ্টিসহ এই বাহিনীকে আধুনিক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- পুলিশের কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও মামলার তদন্ত কাজ দ্রুততার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে থানা সদর থেকে দূরবর্তী অপরাধপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত আগে ৪৭টি তদন্ত কেন্দ্রের অতিরিক্ত আরো ৩৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।
- ঢাকা মহানগর এলাকায় আরো ৬টি নতুন থানা স্থাপন করা হয়।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সন্ত্রাস দমন ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। বহুদিন পর দক্ষিণ বাংলার জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ত্রাস সৃষ্টিকারী অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়। সুইডেন আসলাম ও এরশাদ শিকদার এদের অন্যতম।
- বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২০০১-২০০২ সালে ৮৫৪.৩৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯৫-৯৬ সালে এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ৫১৮.৬৭ কোটি টাকা।
- পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানি চালু করা হয়।
- পুলিশ বাহিনীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়।
- আনসারদের ভাতা ২০% হারে বৃদ্ধি করা হয়। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত ও অঙ্গীভূত আনসারদের স্থায়ী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের রেশন প্রাপ্তির হার দ্বিগুণ করে।
- আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ২৫টি থানা, ৮৬টি তদন্ত কেন্দ্র, ৫৮টি হাইওয়ে ফাঁড়ি, ১৫০টি পুলিশ ক্যাম্প ও ১০টি ফাঁড়ি স্থাপন করে।
- এসআই পদে ৮০৩ জন, সার্জেন্ট পদে ৫০৭ জন ও কনস্টেবল পদে ১৪৬৮০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

- দেশের ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করা হয়।
- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রায় উচ্ছেদ করার ফলে ছাত্রাবাস দখলের যুদ্ধ বন্ধ হয়। ক্যাম্পাসে শান্তি বিরাজ করায় সেশন-জট দূর করার পথ সুগম হয় এবং সেশনজটের অনেক নিরসনও হয়।

১০. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ

- মুক্তিযোদ্ধাদের ২৮.৮ কোটি টাকা ভাতা দেয়া হয়।
- ২০০০-২০০১ অর্থবছরে গৃহীত এক কর্মসূচির অধীনে ৪২ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ভাতা দেয়ার জন্য ১৫ কোটি টাকার একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মুক্তিযোদ্ধাদের দাফন করার প্রথা প্রবর্তন।
- মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সকরারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এই কর্মসূচিতে ৮০ হাজার দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের সহায়তার জন্য ২৮.৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়।
- ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য ৬.৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ১৬.২৫ কোটিতে উন্নীত করা হয়।
- ২০০১-২০০২ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য সরকারের সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫.০৫ কোটি টাকা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : গতিশীল অধ্যায়ের সূচনা

১১.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সূচক হলো জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি। খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে অর্থাৎ ৯১-৯২ থেকে ৯৫- ৯৬ অর্থবছর পর্যন্ত গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৫.৫ শতাংশ। ২০০০-২০০১ সালে প্রবৃদ্ধি হারের প্রাক্কলন ছিল ৬.২ শতাংশ। ২০০২ সালে সংশোধিত হিসেবে এই হারকে ৫.৩ শতাংশে নামালেও নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বছর ধরে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয় আওয়ামী লীগ আমলে ছিল তা ছিল এদেশের ইতিহাসে সর্বোত্তম।

১১.২ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

- খালেদা জিয়ার আমলে ৯৫/৯৬ অর্থবছরে উৎপাদনে (জিডিপি) দেশজ সঞ্চয়ের শতকরা হার ছিল ১৪.৭০। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০০-২০০১ অর্থবছরে সঞ্চয়ের শতকরা হার দাঁড়ায় ১৮.০০ শতাংশ।
- খালেদা জিয়ার আমলে ৯৫/৯৬ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়ের জিডিপি-র শতকরা হার ছিল ২০ শতাংশ। আওয়ামী লীগ আমলে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে এই হারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩.২ শতাংশ।

১১.৩ ক্রমবর্ধনশীল বিনিয়োগ

- ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সরকারি খাতে বিনোয়োগের হার ছিল ৬.৪। ২০০০/০১ অর্থবছরে এই হার ছিল ৭.২।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫/৯৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৮৬ মিলিয়ন ডলার। ২০০০-২০০১ সালে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক বিনিয়োগ (কোটি ডলার)
১৯৭২-১৯৯৮

লেখচিত্র : ৩

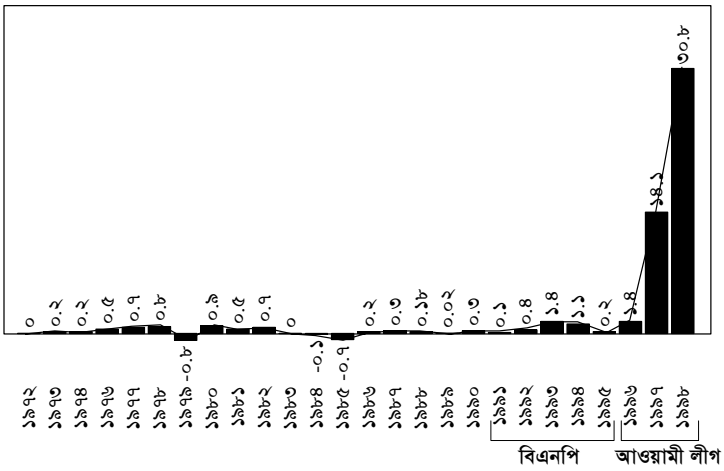

১১.৪ মুদ্রাস্ফীতি : সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন

- শতাব্দীর প্রলয়ঙ্করী বন্যা, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ২০০০ সালের মার্চে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া এবং অন্যান্য সাধারণ পণ্যের দাম প্রায় ৫ শতাংশ

বৃদ্ধি পাওয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক ধস সত্ত্বেও সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়।

- খালেদা জিয়ার আমলে ৯৫-৯৬ অর্থবছরে গড় মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৬.৬ শতাংশ। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে দাঁড়ায় ১.৫৯ শতাংশ এবং পাঁচ বছরব্যাপী এর গড় ছিল মাত্র ৪.৪ শতাংশ।

১১.৫ রাজস্ব আয় ও ব্যয় : উন্নয়নমুখীন

- খালেদা জিয়ার আমলে ৯৫/৯৬ অর্থবছরে সরকারি রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১১,৮১৪ ও ১০,০১৬ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের শেষ অর্থবছরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০,৬৬২ ও ১৬,২৫০ কোটি টাকা।
- মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ তাই ২১,৮৩০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬,৪১২ কোটি টাকা।
- সামাজিক খাতের রাজস্ব ব্যয়ের অংশ ৯০/৯১ সালে ছিল ১৩ শতাংশ। ২০০০/০১ অর্থবছরে সামাজিক খাতের অংশ দাঁড়ায় ২৪ শতাংশ।
- ২০০১-০২ বছরে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ করা হয় ৬,০২৮ কোটি টাকা অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ে ৬৬ শতাংশ।
- ১৯৯৬ সালের মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০০০/০১ সালে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বিগত সরকারগুলোর আমলে দীর্ঘ ১০ বছরে মাথাপিছু আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বিএনপি সরকারের আমলের মাথাপিছু গড় মাসিক ২৮ টাকার স্থলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গড়ে মাসিক ৪৮ টাকা হারে আয় বৃদ্ধি পায়।

১১.৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন

- অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করার আরেকটি সূচক হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নের উৎস। বিদেশ-নির্ভরতা কমিয়ে আনা আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ। এই লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারা নিঃসন্দেহে সাফল্যের পরিচায়ক। ১৯৯৫-৯৬ সালে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৪২.২৫ শতাংশ। আওয়ামী লীগ আমলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে অর্থায়নের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০০০/০১ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯.৯ শতাংশে।

১১.৭ ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা

- খালেদা জিয়ার সরকার দেশের অর্থনীতি খাতে যেসব অনিয়ম ও অরাজকতা সৃষ্টি করে গিয়েছিল, আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনামলে তা দূর করার জন্য

আইনগত কাঠামো উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ব্যাংক ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বন্ধ করা এবং ব্যাংক ঋণ আদায়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাংকিং সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়।

- স্বতন্ত্র ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠা, দেউলিয়া আইন জারি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি জোরদার, বিভিন্ন আইন সংশোধন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং খাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নৈরাজ্য প্রতিহত করে ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হয়।
- বাংলাদেশে তফশিলি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের স্থূল হার '৯৬ সালের ডিসেম্বরে দাঁড়ায় ৪১ শতাংশ, এই হার ২০০০ সালে নেমে আসে ৩৪.০ শতাংশে।
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি এবং অনিয়মাদি দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অর্থনেতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা অর্জন সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে প্রতিভাত হয়।

১১.৮ আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় : ঘাটতি হ্রাস

- ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানি ব্যয় শতকরা ৭.৩৫ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ সময়ে রপ্তানি আয় ৮.১০% বৃদ্ধি পায়।
- বিএনপির শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩,৮৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০০/০১ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৪৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। স্মর্তব্য যে, এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল ১৯৯৭-৯৮ পূর্ব এশিয়ার মন্দা, ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং ২০০০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পটভূমিতে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের দৈনিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার অনুসরণ করে টাকার মূল্যমান ডলার ও পাউন্ডের বিপরীতে নিয়মিত পরিবর্তন করে এশীয় অর্থ-সংকটের ভূমিধস অবমূল্যায়ন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। ক্রমাগত সীমিত অবমূল্যায়নে একদিকে যেমন রপ্তানি উৎসাহিত হয়, অন্যদিকে তেমনি প্রবাসী নাগরিকদের পাঠানো অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বিগত বিএনপি সরকারের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৯৫/৯৬ সালে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ ১২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে আওয়ামী লীগের শেষ বছর অর্থাৎ ২০০০/০১ অর্থবছরে ১৮৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.৯ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

- আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছরের শাসনামলে মাঝেমধ্যে কিছুটা টানাপড়েন সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মোটামুটি সন্তোষজক পর্যায়ে স্থিতিশীল ছিল। বিএনপি আমলের শেষ বছরে একসঙ্গে ১০০০ বিলিয়ন রিজার্ভ খরচ হয়ে স্থিতি ছিল ২০৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী রেখে

এবং ১৯৯৭ ও ১৯৯৮-এর প্রলয়ঙ্করী বন্যার মোকাবিলা করেও ১৯৯৯ সালের জুন মাসে রিজার্ভ থাকে ১৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১১.১০ রাজস্ব কমিশন

- দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অধিকতর সম্পদ সংগ্রহের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি রাজস্ব কমিশন গঠন করা হয়।

১১.১১ সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন

- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সমস্ত ব্যয় পর্যালোচনা করে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১১.১২ ভিআইপি কার্ড

- বিদেশে কর্মরত যে প্রবাসী নাগরিক বছরে এক লাখ, পঞ্চাশ হাজার বা বিশ হাজার ডলারের বেশি অর্থ দেশে পাঠাবেন, তাদের যথাক্রমে বিশেষ ভিআইপি কার্ড, গোল্ড কার্ড ও সিলভার কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব কার্ডধারী ব্যক্তিবৃন্দ যাতে বিনা কমিশনে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে পারেন, বিমানবন্দরে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পান ও দেশের অভ্যন্তরে বিমান, রেলওয়ে ও সড়ক পরিবহন সংস্থার টিকিট ক্রয়ে অগ্রাধিকার পান, সেই বিধান রাখা হয়।

১৩.১ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য : ভিক্ষার ঝুলি ফেলে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত

- খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন আওয়ামী লীগের অবিস্মরণীয় সাফল্য। কৃষি খাতকে বিএনপি সরকার চরম অবহেলা করেছিল। ন্যায্যমূল্যে সার কিনতে চাওয়ার অপরাধে ১৮ জন কৃষককে বিএনপি সরকারের পুলিশের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। 'দেশে খাদ্য ঘাটতি থাকলে বেশি করে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে-- বিএনপি সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কৃষিখাত চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। ফলে কৃষিখাতে নেমে এসেছিল স্থবিরতা। কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল।
- আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। এই লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কৃষিনীতি গ্রহণ করা হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও কৃষিনীতি বাস্তবায়নের জন্য উলেখযোগ্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা করা হলো, সেগুলো ছিলো--

ক) ব্যাপকভাবে কৃষিঋণ ও তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বিএনপি আমলে কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল গড়ে ১,১৯৫ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ আমলে গড়ে ঋণ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ২,৩৯৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, বর্গাচাষীদেরও কৃষিঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

কৃষি ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)
১৯৯১-১৯৯৯

লেখচিত্র : ৪

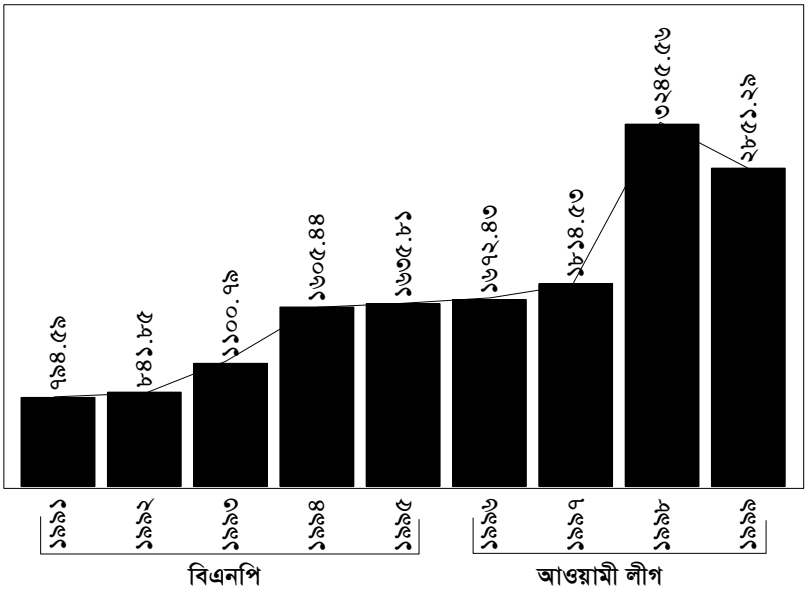

খ) ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ও সেচযন্ত্রসহ সকল কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর থেকে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে দেশে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

গ) সুলভ মূল্যে সার সরবরাহ এবং সারের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য দাতাদের আপত্তি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচ বছরে ৫১১ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করে।

ঘ) পরোক্ষ ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের বিদ্যুৎ ও ডিজেল সহনীয় মূল্যে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভর্তুকি ছিল ২৬.৪ শতাংশ এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে ছিল ২৭ শতাংশ।

মৃত্তিকা বিশ্লেষণের জন্য ১০টি ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার চালু করার জন্য ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ১৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

শাক-সবজির রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হরটেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্যাকেজিংয়ের জন্য ৪ কোটি টাকা সহায়তা দানের প্রস্তাব রাখা হয়।

সারের মান নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল সার আমদানি ও বিক্রয় বন্ধের লক্ষ্যে সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৯৯ জারি করা হয়।

কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণের জন্য ইফাদ-এর সহযোগিতায় ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।
বীজ আইন/৯৩ সংশোধন করে বীজ আইন/৯৭ প্রবর্তন করা হয়।
দক্ষতা ও পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য বিএডিসি-কে ঢেলে সাজানো হয়।

ঙ) ধান, গম ও সবজির উচ্চ ফলনশীল বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহে দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম বহুলাংশে নিশ্চিত করায় ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়। বিএনপি আমলের ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং ২ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন-এর রেকর্ড পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ সরকারের যুগান্তকারী সাফল্য। ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশবাসীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আওয়ামী লীগ আমল ও বিএনপি আমলের খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকেই দুই আমলের সাফল্য ও ব্যর্থতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে।

সারণি-২ : আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আমলের খাদ্যশস্য উৎপাদনের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি

weGbwc Avgj		
1991-92-------193.2	ceeZx eQ‡ii Zjbvq cew×	2.4%
1992-93-------195.2	H	1.0%
1993-94-------191.7	H	-1.8%
1994-95------180.8	H	-5.7%
1995-96------190.6	H	5.4%
AvIqvgx jxM Avgj		
1996-97 -------203.37	ceeZx eQ‡ii Zjbvq cew×	6.7%
1997-98 -------206.64	H	1.6%
1998-99--------218.13	H	5.6%
1999-2000-----249.07	H	14.2%
2000-01 --------264.91	H	7.4%

তথ্য উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১৩.২ খাদ্যনিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

- ২০০০-২০০১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়।
- প্রতি মৌসুমে বাজার মূল্যের চেয়ে উচ্চতর হারে খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
- মৎস্য উপ-খাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ইফাদ-এর সহায়তায় ১০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- জাটকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের অর্থায়নে ৫১.৪৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গৃহীত হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% এবং দেশীয় রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬ শতাংশ আসে মৎস্য উপ-খাত থেকে।
- পশু সম্পদের উন্নয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে অংশীদারিত্বমূলক পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
- চারটি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়।
- দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৯৯৯/২০০০ অর্থবছরে নিজস্ব সম্পদে বিদেশ থেকে কোনো খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়নি।
- খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, মৌসুম ভেদে খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা, দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় খাদ্যশস্য মজুদের ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য দেশের কৌশলগত স্থানসমূহে নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ করা হয়।
- আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ১৩ লাখ ৮ হাজার টন এবং এর গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় টেস্ট রিলিফ হিসেবে ৪ লাখ ৩২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
- দুস্থ ও স্বল্প আয়ের জনগণের জন্য ন্যায্যমূল্যে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যায্যমূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়।
- খাদ্য ও কৃষিনীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন ও ঘাটতি সম্পর্কে আগাম তথ্য সরবরাহ করা এবং খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ ও নিয়মিত সতর্ক করার লক্ষ্যে পূর্ব-সতর্কীকরণ এবং খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

সারণি-৩ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচক ১৯৯০-২০০১ (বিলিয়ন টাকায়)

বছর	জিডিপি	প্রবৃদ্ধি কৃষি	প্রবৃদ্ধি শিল্প	মোট প্রবৃদ্ধি	জিডিআই	জাতীয় সঞ্চয়	সরকারি বিনিয়োগ
১৯৯০/১	৮৩৪	১.৪	২.৪	৩.৩	১৬.৯	১৪.৬	৫.৭
১৯৯১/২	১১৯৫	১.৩	৭.৪	৫.০	১৭.৩	১৩.৯	৭.০
১৯৯২/৩	১২৫৩	১.৮	৮.৬	৪.৬	১৭.৯	১২.৩	৬.৫
১৯৯৩/৪	১৩৫৪	-০.৬	৮.১	৪.১	১৮.৪	১৩.১	৬.৬
১৯৯৪/৫	১৫২৫	-২.০	১০.৫	৪.৯	১৯.১	১৩.১	৬.৭
১৯৯৫/৬	১৬৩৩	২.০	৬.৪	৪.৬	২০.০	১৪.৭	৬.৪
গড়		০.৫৮	৮.২	৪.৬৪	১৮.৫৪	১৩.৪২	৬.৬৪
১৯৯৬/৭	১৮০৭	৫.৬	৫.০	৫.৪	২০.৭	১৫.৯	৭.০
১৯৯৭/৮	২০০২	১.৬	৮.৫	৫.২	২১.৬	১৭.৪	৬.৪
১৯৯৮/৯	২১৯৭	৩.২	৩.২	৪.৯	২২.৩	১৭.৭	৬.৭
১৯৯৯/০	২৩৭১	৬.৯	৪.৮	৫.৯	২৩.০	১৭.৯	৭.৪
২০০০/১	২৫৮১	৫.৫	৬.৭	৬.২	২৩.১	১৮.০	৭.২
	গড়	৪.৫৬	৫.৬৬	৫.৫২	২২.২২	১৭.৩৮	৭.০৪

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চিত্র : ১৯৯১/৯২-২০০০/০১

(পাঁচ বছরের গড় : বি এন পি'র পাঁচ বছর ও আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর)

লেখচিত্র : ৫

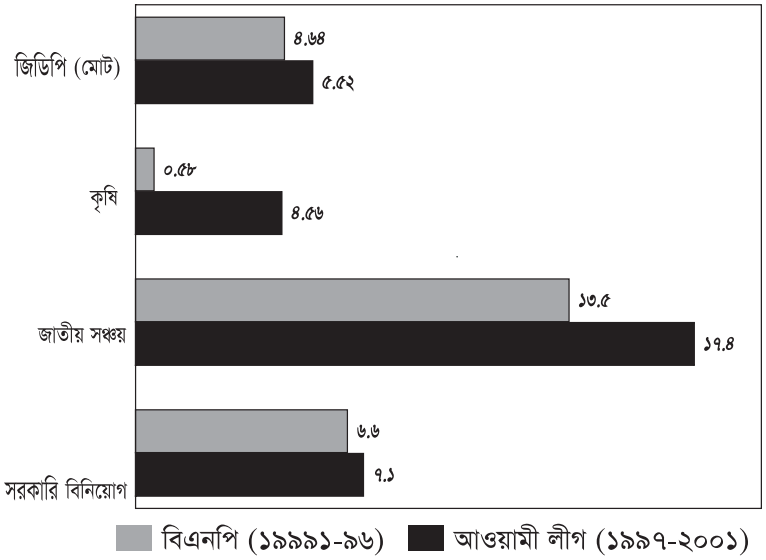

১৪. পানিসম্পদ : সুষ্ঠু, সমন্বিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত ত্রিশ বছর মেয়াদি ঐতিহাসিক চুক্তি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি পানি সম্পদ উন্নয়নে বিরাজমান বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল মাইলফলক।
- উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে সারা বছর দুটি দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন কার্যক্রম শুরু হয়।
- পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় ১৯৯৮ সালের শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা লাভ করে। ১৯৯৯ সালের শুষ্ক মৌসুমের প্রথমভাগে বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী হিস্যার বেশি পানি লাভ করে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা এখন নিয়ন্ত্রণে এবং উত্তরাঞ্চলের মরুময়তা এখন বন্ধ।
- উলিখিত চুক্তির সুফল হিসেবে দীর্ঘ চার বছর বন্ধ থাকার পর জি.কে. প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়।
- তিস্তা ও অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা হয়।
- গঙ্গা বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ভারত ও নেপাল বাঁধ নির্মাণে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ জাপান, ইতালি, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দানের আশ্বাস দেয়।
- ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে গড়াই নদীর পুনর্খনন প্রকল্পের কাজ নেওয়া হয়।
- ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সমস্যা দূর করার জন্য সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যা বিগত সরকারের আমলে বন্ধ ছিল।
- দেশব্যাপী নদী ও খাল খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙন থেকে জনপদ ইত্যাদি রক্ষার জন্য ৮২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।
- জি.কে. পাম্প ও ফিডার চ্যানেল প্রতিরক্ষা বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়।
- মেঘনা মোহনা সমীক্ষার ফ্যাপ ৫-বি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়।
- ভোলা সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ করা হয়।
- কপোতাক্ষ নদ পুনর্খননের সম্ভাব্য সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হরা হয়।
- এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ছিল-
- উপকূলীয় অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প।

- বড়াল বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প।
- খরাউত্তর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় গভীর নলকূপ মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প।
- চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প।
- নোয়াখালী খালের পুনর্খনন প্রকল্প।
- কুমিলা ও চাঁদপুর জেলায় নতুন ডাকাতিয়া নদীর পুনর্খনন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।
- ১৯৯৯ সালে দেশের ৩৩টি জেলার নদীতীর সংরক্ষণসহ শহর ও বন্দর রক্ষার কাজ শুরু।
- ঢাকা মহানগরী বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প।

১৫. স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন : সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র

- ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯৩৮২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়।
- এলজিইডি গত পাঁচ বছরে ২২,১৫৯ কিলোমিটার মাটির সড়ক, ৯১৭৭ কিলোমিটার পাকা রাস্তা নির্মাণসহ ৭২৮টি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণ করে।
- ইউনিয়ন কাউন্সিলের সচিবদের সরকারি অনুদানের হিস্যা ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের জন্য ২০০১/০২ সালের রাজস্ব বাজেটে ৫.৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়।
- প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানি বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বাজেটে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য সরকারি অনুদান বাবদ এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই স্থানীয় সরকার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে।
- এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, যথা গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া হয়।।
- ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি হস্তান্তর করে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আয়ের উৎস যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায়, সেদিকটিও সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল।

- আওয়ামী লীগ সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল পল্লী অঞ্চল। আর তাই ৯৫/৯৬ অর্থবছরে যেখানে পল্লী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭২৭.২৪ কোটি টাকা, সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০০/২০০১ অর্থবছরে এ-খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১৮২৩.৭৬ কোটি টাকা করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের বিগত ৫ বছরে এই খাতে মোট বরাদ্দ ২৫০ শতাংশ বেড়েছে।

১৬.১ শিল্প-সভ্যতার ভিত্তি রচনার উদ্যোগ

- শিল্পখাতে তিনটি নতুন সার কারখানা স্থাপন, দুটি সার কারখানা পুনর্বাসন ও একটি কাগজ মিলের পুনর্বাসন করা হয়। এই ৬টি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৭৩.৭১ কোটি টাকা।
- সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদীতে শিল্প পার্ক, নারায়ণগঞ্জে হোসিয়ারি শিল্প নগরী এবং চকোরিয়াতে মৎস্য ও কৃষিভিত্তিক শিল্প নগরী স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- ২০০০-২০০১ অর্থবছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। গত পাঁচ বছরে শিল্প প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার অর্জিত হয়েছিল ১৯৯৭/৯৮ সালে ৮.৫ শতাংশ।
- ব্যাপক হারে কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস ও বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ফলেই শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়।
- শ্রম ও জনশক্তি খাতে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়।
- সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় অগ্রণী বন্ড এবং সমমূলধন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য অর্থায়নের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
- রুগ্‌ণ শিল্পের সমস্যার সমাধান স্থায়ী ভিত্তিতে করা হয়।
- দেশে শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য একটি যুগোপযোগী নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়।
- সামগ্রিকভাবে দেশে বিনিয়োগের অনুকূলে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ব্যবসা-সহায়ক (Business Friendly) নীতির সুফল জনগণ বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে পেতে শুরু করে।
- বৃহৎ শিল্পে উৎপাদনসূচক ১৯৮৮/৮৯ অর্থবছরে ১০০ ধরে বিগত সরকারের আমলে ১৯৯২/৯৩ সালের ১৪১.৮০-এর চাইতে ২০০০/০১ সালে গড় সূচক দাঁড়ায় ২২৮.০৪। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে ১৭,০৩১ থেকে ২০০০/০১ সালে ৪৪,১৭৭-এ বৃদ্ধি পায়।
- ২০০০/০১ অর্থবছরে ১,০৯১টি ক্ষুদ্র ও ৩,৫৯৬টি কুটির শিল্পকে বিসিক-এ নিবন্ধন করা হয়।
- ২০০০/০১ অর্থবছরে ১২,২২৬টিসহ আরো নতুন ১২,৩১৫টি কুটির শিল্প ইউনিটকে এবং আগের ৮২২টিসহ নতুন ৮৯৯টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে ৫৭টি শিল্প নগরী স্থাপন করা হয় এবং ১৩টি শিল্প নগরী স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।
- ১৯৯৫/৯৬ থেকে ২০০০/০১ অর্থবছর পর্যন্ত বিসিক-এর অধীনস্ত নিবন্ধনকৃত শিল্প ইউনিট-এর আওতায় ৬৪,০২৪ জন থেকে ৭২,৫৯৫ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
- বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য সরকার প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডকে পুনর্গঠিত করে। '৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২টি শিল্প ইউনিট বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর / বিক্রয় করা হয়।
- চট্টগ্রাম ও ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ (ইপিজেড) এলাকায় বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৫/৯৬ অর্থবছরে ছিল ৩০.৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৯৮/৯৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭১.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ২০০০/০১ অর্থবছরে ইপিজেড-এর শিল্প কারখানা থেকে ১০৬৭.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয় যা জাতীয় রপ্তানির ১৬.৫০ শতাংশ।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় ১১২টি শিল্প কারখানা উৎপাদনে ছিল এবং ১০৭টি শিল্প কারখানা বাস্তবায়নের পর্যায়ে ছিল।
- ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা সম্প্রসারণ এবং গাজীপুর, মংলা, ঈশ্বরদী ও কুমিলায় নতুন ইপিজেড এলাকা স্থাপন করা হয়।
- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৯৬ কোটি টাকার বিনিয়োগ ধরা হয়। মোট বিনিয়োগের ৪৪ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৫৬ শতাংশ বেসরকারি খাতে ধরা হয়।
- নিয়ন্ত্রণ কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন পুনর্গঠন করা হয়।
- শেয়ার বাজারের অনিয়ম রোধকল্পে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আওয়ামী লীগ আমলে বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পঞ্চম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষষ্ঠ বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছিল।

- তাঁতবস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেনারসি পল্লী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঁতিদের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন ও পুনর্বাসন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।
- প্রান্তিক তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় সংবলিত ক্ষুদ্র কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।
- হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাত চিংড়ি নিয়ে ই.সি এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের সাথে রপ্তানি খাতের প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমবারের মতো আমদানি ও রপ্তানিকারকদের এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ৪ বছর মেয়াদি আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে।

১৬.২ তথ্য-প্রযুক্তি : নতুন দিগন্ত উন্মোচন

- খালেদা জিয়ার প্রথমবারের শাসনামলে (১৯৯১-৯৫) বাংলাদেশকে বিনামূল্যে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ দিতে চাইলে তা প্রত্যাখান করা হয়। ফলে বাংলাদেশ বিপুল সম্ভাবনাময় কিন্তু প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ আন্তর্জাতিক তথ্য-প্রযুক্তি সড়কের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে এই খাতের উন্নয়নে নতুন নীতিমালা গ্রহণ করে। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের বিকাশে দেয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব।
- সফ্টওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে আই,টি ভিলেজ এবং হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রহণ করা হয় বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা।
- কম্পিউটার খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য শুল্কমুক্তভাবে কম্পিউটার সফ্টওয়্যার আমদানির অনুমোদনসহ বিভিন্ন বাস্ত বমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- সফ্টওয়্যার শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০১/২০০২ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। একটি বোর্ড এই তহবিলের ব্যবস্থাপনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। কম্পিউটার ও কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা করে ১৯৯৭-'৯৮ সালে এই ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করা হয়। এর আগে অর্থাৎ ১৯৯৬-'৯৭ সালে মোবাইল ফোন এবং ভি-স্যাট স্থাপনায় ব্যক্তিমালিকানা খাতের সুযোগ দিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। একই সঙ্গে মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে মোবাইল টেলিফোনের সংখ্যা ছিল মাত্র ২

হাজার আর প্রতিটির দাম ছিল লাখ টাকার বেশি। ২০০১ সালে মোবাইল টেলিফোনের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭ লাখ এবং দাম পড়ে গড়ে ৭ হাজার টাকা। যে কম্পিউটার দেড়/দুই লাখ টাকার কমে পাওয়া যেত না, তা এখন পাওয়া যায় ৩০ হাজার টাকায়। সারাদেশে যেখানে ৫ থেকে ১০ হাজার কম্পিউটার ব্যবহৃত হতো, সেখানে এখন কম্পিউটারের মাসিক বিক্রির সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। ১৯৯৬ সালে যেখানে কম্পিউটার বিপণি গড়ে ওঠার সংখ্যা ছিল বছরে মাত্র ৫০টি, এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বছরে ১৫শ। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ তৈরিতে, কম্পিউটারের অ্যাসেমব্লিতে, সফট্ওয়্যার সৃষ্টিতে এবং ডাটা প্রসেসিং কাজে তরুণ-তরুণীসহ লক্ষ লক্ষ লোক পেশাগতভাবে জড়িত। এক কথায় গোটা কম্পিউটার ব্যবসা এখন কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে গতিশীল খাত।

১৭.১ বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু : পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ

- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম স্থাপনা এবং বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন উদ্বোধন করা হয়। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় এই সেতু এক বৈপ্লবিক অধ্যায় সংযোজন করে।
- বঙ্গবন্ধু সেতুকে যোগাযোগ স্থাপন, গ্যাস, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও আধুনিক টেলিযোগাযোগের বহুমুখী কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন সেকশনে ৫শ' কিলোমিটার রেল লাইন পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয়। এই পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থসহ ৪৮৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পূর্বাঞ্চলের সাথে রেল লাইন সংযোগের কাজও এগিয়ে চলে।
- বঙ্গবন্ধু সেতু সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উন্নয়ন ও ঢাকা-সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন সেতু নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজও চলতে থাকে।

১৭.২ সড়কপথ, জলপথ ও বিমানপথের উন্নয়ন

- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছরে ১৫ হাজার ১২৮ কি.মি. সড়ক সম্পূর্ণ পাকা করা হয়, ৩৫ হাজার ৮০২ কিলোমিটার মাটির রাস্তা এবং ১৩৬৯ কি.মি. পথে ইট বিছানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬৫২৬ কি.মি. পাকা সড়ক ও ১০,৮৬৫ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করে। ২০০১/০২ অর্থবছরে ১৯২৪ কি.মি. পাকা সড়ক ও ৫৬৫৫ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং ৩০৯৪টি সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করার বাজেট বরাদ্দ আওয়ামী লীগ সরকার করেছিল।

- ১৯ হাজার বৃহৎ মাঝারি, ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।
- পাশাপাশি এই আমলেই ২০,৯৪৬ মিটার স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়।
- ২০০১/০২ অর্থবছরে পাকশি সেতু নির্মাণের জন্য ১২০ কোটি টাকা, যমুনা সংযোগ সড়কের জন্য ২১০ কোটি টাকা, ধরলা সেতু নির্মাণের জন্য ৩০ কোটি টাকা, দোয়ারিকা সেতু নির্মাণের জন্য ৩০ কোটি টাকা, গাবখান সেতু নির্মাণের জন্য ৪০ কোটি টাকা, রূপসা সেতুর জন্য ৪৫ কোটি টাকা, পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য ৩ কোটি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেঘনা সেতুর জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।
- ২০০১ সালের ২০মে ১৪৭৯ মিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু স্থানীয় প্রযুক্তির ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়।
- পাকশীতে পদ্মা নদীর ওপর জাপানি সহায়তায় ৪১০.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়।
- মেঘনা নদীতে ভৈরব বাজারে ব্রিটিশ সহায়তায় ৪৫৩ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু নির্মাণের কাজ আওয়ামী লীগ সরকারই শুরু করেছিল।
- সিলেট-জাফলং সড়ক উন্নয়নে সুরমা দ্বিতীয় সেতু এবং ভোলা-বরিশাল-লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছিল।
- রেল ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও যাত্রীসেবার মানোন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন রেলপথ পরিচালনায় বেসরকারি সেক্টরকে সম্পৃক্ত করে সেবার মান উন্নত করা হয়।
- ঢাকা ও অন্যান্য শহরের জন্য বিআরটিসি ২০০টি দ্বিতল বাস সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব বাস অনতিবিলম্বে ঢাকা ও রাজশাহী শহরে চলাচল শুরু করে।
- রাজধানী ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ, বেশ কিছু সড়ক সংযোগস্থলের উন্নয়ন এবং কম্পিউটারাইজ্ড ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ হাতে নেয়া হয়।
- নৌ-পরিবহন খাতের উন্নয়নে ৩২টি প্রকল্পের কাজও চলতে থাকে।
- চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ জট নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে নৌ-পরিবহন টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়।
- স্থল থেকে পণ্য পরিবহনকে আকর্ষণীয় করার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজ চলতে থাকে।
- চট্টগ্রাম এম.এ. হান্নান বিমানবন্দরকে দেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর করা হয়।

- সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরিত করা হয়।
- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা ও সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের সম্প্রসারণ ও ২টি নতুন বোর্ডিং ব্রিজ স্থাপন করা হয়।
- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো চলাচলের সুবিধা প্রসারের লক্ষ্যে কার্গো ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেয়া হতে থাকে।
- বগুড়া ও বাগেরহাট বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজ ছিল সমাপ্তির পথে।
- ১৯৯৯ সালের জুন মাসে ঢাকা-কোলকাতা বাস সার্ভিস চালু করা হয়।
- ২০০০-২০০১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।
- সড়ক পথে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য সাউথ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ট্রায়াঙ্গল প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।
- বিআরটিসি সিটি সার্ভিস, সিটি সার্কুলার, সিটি লিংক সার্ভিস এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার নির্দেশে মহিলা বাস সার্ভিস প্রবর্তন হয়।
- টুরিস্ট বাস সার্ভিস এবং বঙ্গবন্ধু সেতু পারাপারের জন্য বিশেষ টুরিস্ট বাস সার্ভিস চালু করা হয়।
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম পাঁচটি ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার স্থাপন করা হয়।
- ৬০৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইনসমূহের পুনর্বাসনের কাজ অগ্রসর হতে থাকে।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে যানজট নিরসন এবং সুষ্ঠুভাবে মালামাল হ্যান্ডলিং করার জন্য বন্দরে পৃথক ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।
- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষায় ১০০ লাখ ঘন মিটার ড্রেজিং করা হয়।
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের চলাচল নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে বন্দর বা দপ্তরের সাথে বিভিন্ন নৌযানের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করা, নৌযানসমূহের অবস্থান জানা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ও বিপদসঙ্কেত প্রদানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়।
- ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহুতল বিশিষ্ট কারপার্ক নির্মাণের কাজ অগ্রসর হতে থাকে।
- ২০০১ সালে ঢাকায় যে ন্যাম সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল, সে উপলক্ষে বিমানবন্দরে রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে মেরামত, দুটি বোর্ডিং ব্রিজ নির্মাণ, বোর্ডিং ব্রিজ সংলগ্ন হোল্ডিং লাউঞ্জ নির্মাণ এবং অ্যাপ্রোন সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে অধিকতর যাতায়াত ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে দুটি দেশের মধ্যে সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করা হয়।

১৮.১ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতে অগ্রগতি

দীর্ঘকালের অবহেলার ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে আওয়ামী লীগ সরকার এই খাতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নিয়ে চাহিদার বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সরকার গঠনের মাত্র ৩ মাসের মাথায়, ১৯৯৬ সালে অক্টোবর মাসে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার বিস্তারিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলাদেশর প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া এবং বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করাই ছিল এই নীতিমালার উদ্দেশ্য। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সরবরাহের লক্ষ্য সামনের রেখে ভিশন স্টেটমেন্ট (Vision Statement) ও পলিসি স্টেটমেন্ট অন পাওয়ার সেক্টর রিফর্মস (Policy Statement on Power Sector Reforms) প্রণয়নও অনুমোদন করা হয়।

- ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছরে দেশে বিদ্যুতের কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬৪২ মেগাওয়াট। আওয়ামী লীগ সরকার পাঁচ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ২০০০-২০০১ অর্থবছরে সরকারি খাতে ৩৩২০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৬৮৫ মেগাওয়াটসহ স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা ৪০০৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। (সূত্র বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২ অর্থমন্ত্রণালয়) অন্যদিকে কার্যকর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০৩ মেগাওয়াটে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (গিগা ওয়াট/ঘণ্টা)
(১৯৭১-২০০০)

লেখচিত্র : ৬

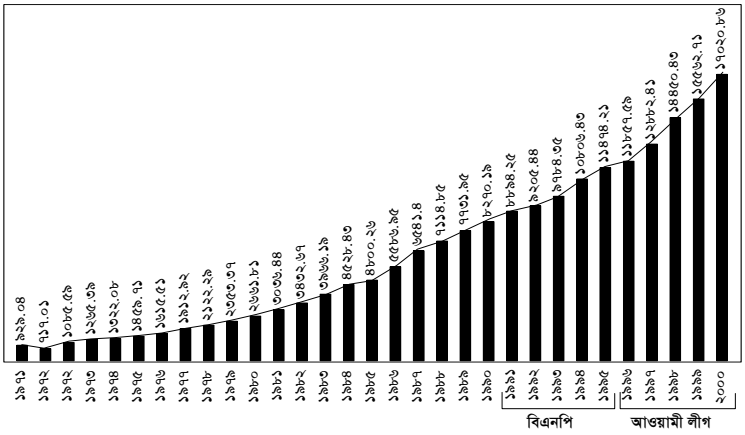

- ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের প্রাক্কালে দেশে বিরাজমান ভয়াবহ বিদ্যুৎ ঘাটতি নিরসনে বেশ কয়েকটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই নিম্নোক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে চালু হওয়ায় লোডশেডিং-এর মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে।

সারণি-৪

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	উৎপাদন শুরু
	সরকারি খাত		
১।	রাউজান স্টিম প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট)	২১০	২১-০৯-১৯৯৭
২।	ঘোড়াশাল স্টিম প্ল্যান্ট (৬ষ্ঠ ইউনিট)	২১০	৩১-০১-১৯৯৯
৩।	শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন (১ম ইউনিট)	৩৫	২৭-০৩-২০০০
৪।	শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন (২য় ইউনিট)	৩৫	৩৩-১০-২০০০
	উপ-মোট :	৪৯০	
	বেসরকারি খাত		
৫।	হরিপুর বার্জ মাউন্টেড	১১০	৩০-০৬-১৯৯৯
৬।	খুলনা বার্জ মাউন্টেড	১১০	০২-১০-১৯৯৮
৭।	বাঘাবাড়ী বার্জ মাউন্টেড	৯০	২৬-০৬-১৯৯৯
	উপ-মোট :	৩১০	

	সরকারি/বেসরকারি মিশ্র খাত		
৮।	ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (১ম পর্যায়)	৭০	২২-১১-১৯৯৯
৯।	ময়মনসিংহ গ্যাস টারবাইন (২য় পর্যায়)	৭০	০৫-১২-২০০২
	উপ-মোট :	১৪০	

উৎস : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২)।

উল্লেখিত সরকারি হিসাব থেকে দেখা যায়, সরকারি খাতে ৪৯০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৩১০ মেগাওয়াট, মিশ্রখাতে ১৪০ মেগাওয়াট ছাড়াও সরকারি খাতের পুরোনো প্ল্যান্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে ৪৩৪ মেগাওয়াট এবং ক্যাপ্টিব জেনারেশনের ৫০০ মেগাওয়াটসহ মোট ১৮৭৪ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ আওয়ামী লীগ আমলে উৎপাদিত হয়েছে।

- ১৯৯৪/৯৫ অর্থবছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৯১ কিলোওয়াট ঘণ্টা, ২০০০-২০০১ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। গত পাঁচ বছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

- বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়। ২০০০/০১ অর্থবছরে ১৭৭০ কোটি টাকার জায়গায় ২০০১/০২ অর্থবছরে ২২০২ কোটিতে উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ বরাদ্দ প্রায় ২৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

- 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' এই নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সরকার আশু ও স্বল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়াও যে সব মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল তার মধ্যে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ কাজ আগামী ২০০৪-২০০৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা। এর ফলে ১৪০৯ মেগাওয়ার্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। এছাড়া ২০০৩ সালের মধ্যে বেসরকারি/মিশ্র খাতের ৩টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে আরও ৮৫৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। নির্মাণাধীন এসব বিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়াও আগামী ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে সরকারি খাতে ১৬৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৯টি এবং বেসরকারি খাতে ১০৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেছিল।

নিম্নোক্ত সারণীতে নির্মাণাধীন ও নির্মিতব্য কোন প্রকল্প সম্ভাব্য কোন বছর চালু হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

চলতি ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

সারণি-৫

প্রকল্পের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	চালুর সম্ভাব্য সময়
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সরকারি খাতে চলতি প্রকল্প :		
১। বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫০	২০০৩-২০০৪
২। হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল	১০৯	২০০২-২০০৩
৩। সিদ্ধরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	২০০২-২০০৩
৪। সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস টারবাইন	১২০	২০০২-২০০৩
৫। ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল (২য় পর্যায়)	৯০	২০০৩-২০০৪
৬। টংগী গ্যাস টারবাইন	৮০	২০০২-২০০৩
৭। ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল	৪৫০	২০০৩-২০০৪
৮। কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্ধিতকরণ	১০০	২০০৪-২০০৫
বেসরকারি খাতে/মিশ্র খাতে চলতি প্রকল্প		
১। হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল (এ. ই. এস)	৩৬০	২০০১-২০০২
২। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর (ওয়েস্টমন্ট)	৪৮	২০০১-২০০২
৩। মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড সাইকেল (এ. ই. এস)	৪৫০	২০০২-২০০৩
সরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন প্রকল্প		
১। খুলনা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২১০	২০০৪-২০০৫
২। সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	২১০	২০০৪-২০০৫
৩। সিলেট ও চাঁদপুর ১৫০ মেঃ ওঃ গ্যাস টারবাইন	২০০	২০০৩-২০০৪
৪। ভোলা গ্যাস ফায়ার্ড প্ল্যান্ট	১৫০	২০০২-২০০৩
৫। সিরাজগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল	৪৫০	২০০৫-২০০৬
৬। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর	৮০	২০০৪-২০০৫
৭। মংলা গ্যাস টারবাইন	১০০	২০০৬-২০০৭
৮। চাঁদপুর কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর	২০০	২০০৬-২০০৭
৯। গাজীপুর গ্যাস টারবাইন	৪০	২০০২-২০০৩
বেসরকারি খাতের পরিকল্পনাধীন প্রকল্প :		
১। মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড সাইকেলে (২য় পর্যায়) (মারুবিনি)	৪৫০	২০০৩-২০০৪
২। পবিবো'র আওতায় বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন	৮০	২০০১-২০০২
৩। বাঘাবাড়ী কম্বাইন্ড সাইকেল (সিনারজী)	১৭০	২০০২-২০০৩
৪। WRIP প্রকল্প	৩৫০	২০০৩-২০০৪

উৎস : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২)।

উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ এবং শিল্প কারখানার নিজস্ব প্রয়োজনে আওয়ামী লীগ সরকার বেসরকারি মালিকানায় ১০ মেগাওয়াট পর্যন্ত ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১০×৩)=৩০ মেগাওয়াট চালু হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫ মেগাওয়াট, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১০ মেগাওয়াট, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ১০ মেগাওয়াট এবং ঢাকার অদূরে রহিম স্টিল মিলসের ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা। মোদ্দাকথা বিদ্যুৎ উৎপাদনে আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে আসা প্রকল্পগুলোর কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর নাগাদ ২০% রিজার্ভ মার্জিনসহ একটি নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আওয়ামী লীগ যে পথ রচনা করে এসেছে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সেই পথ অনুসরণ করলে ২০২০ সালের আগেই বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা লাভ করবে।

- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অ্যানার্জি সিকিউরিটি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।
- ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৫৪ হাজার ৪৮৯ কি.মি. বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করে ১৩ হাজার ৭১৩টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ৫৫৫৩৭৮ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজ দীর্ঘদিনের অবহেলার কারণে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও নিয়মিত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ অসম্ভব হয়ে ওঠে।
- বেসরকারি খাতে ২২৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়, যার মধ্যে ৮১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হয়।
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর আমদানির ওপর শুল্ক ও ভ্যাট মওকুফের সুবিধা প্রদানের ফলে বেসরকারি খাতে ৫০০ মেগাওয়াট স্থির বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।
- পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিদিন প্রায় ৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৩,৭১৩টি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করা হয়। এছাড়া আরো ৩৪ হাজার গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।
- ৩২ হাজার নতুন সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়।

১৮.২ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়।
- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জ্বালানি খাতে অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা বার্ষিক ৯.২৮ শতাংশের বিপরীতে ১৫.১৩ শতাংশ অগ্রগতি অর্জিত হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের মোট ২৩টি অনুসন্ধান ব্লকের মধ্যে ৮টি-তে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য স্থানীয় ও বিদেশী সংস্থার সাথে চুক্তি অনুযায়ী চারটি কোম্পানি তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে।
- ১৯৯৬ সালের জুন মাসে গ্যাসের ব্যবহার ছিল ২৫২.৯৫৪ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০০০/০১ সালে তা ৩৪৮.৭১৪ ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে।
- অতি দ্রুততার সাথে আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস পাইপ-লাইন চালু করা হয়। ফলে চট্টগ্রামে অতিরিক্ত ৮০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
- দৈনিক ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে ২০০১/২০০২ বছরে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদনের রেকর্ড স্থাপিত হয়।
- সিলেট অঞ্চলে ৫ হাজার টনের একটি এল.পি.জি. প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়, যা বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ করে পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখে।
- দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উত্তোলনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ওপর আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।
- আওয়ামী লীগ সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০০৩/০৪ সাল নাগাদ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে এবং বছরে ১ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
- বড়পুকুরিয়া খনি থেকে উত্তোলিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্পের কাজ আওয়ামী লীগ আমলেই শুরু হয়। আগামী ২০০৩/০৪ সাল নাগাদ চালু হলে এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯. টেলিযোগাযোগ : ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী

- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নততর সেবা প্রদান নিশ্চিত করে ১৯৯৮ সালে একটি টেলিফোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

- ১৯৯১-এর বিএনপি সরকারের আমলে সৃষ্ট মোবাইল টেলিফোনে মনোপলির অবসান ঘটিয়ে আরও ৪টি বেসরকারি কোম্পানিকে সেলুলার মোবাইল টেলিফোন চালু করার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এর ফলে মাত্র ২০০০ মোবাইল সংযোগের বিপরীতে ৬ লাখ গ্রাহককে সংযোগ প্রদান সরবরাহ হয়।
- ৪টি বেসরকারি সেলুলার টেলিফোন প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাহককে টেলিফোন সংযোগ দেয়।
- বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড ন্যাশনওয়াইড ডায়ালিংয়ের মাসুল ও দেশীয় গ্রাহকদেও জন্য আন্তর্জাতিক টেলিফোনের মাসুল হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যা, জুলাই ২০০১ থেকে কার্যকর হয়।
- দেশীয় গ্রাহকদের জন্য এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে টেলিফোনের হার ৭.৪ শতাংশ থেকে ১৪.২৯ শতাংশ, আমেরিকা এবং ইউরোপের জন্য ১৬.৬৭ শতাংশ, সার্কভুক্ত দেশের জন্য ১৪.২৯ শতাংশ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, যা ১ জুলাই ২০০১ থেকে কার্যকর হতে শুরু করে।
- ন্যাশনওয়াইড ডায়ালিং-এর জন্য বর্তমানে দূরত্বভেদে মাসুলের পাঁচটি স্তর রয়েছে। ১ জুলাই ২০০১ থেকে এই মাসুলের হার তিনটি স্তরে হ্রাস করা হয় এবং মাসুল ১৩.৪ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশ হ্রাস পায়।
- আওয়ামী লীগের শেষ বছরে বাংলাদেশে টি অ্যান্ড টি বোর্ডের ৭ লক্ষ গ্রাহক লাইনের স্থিরীকৃত সার্ভিস প্রদান করতে শুরু করে।
- ২০০০ সালের শেষ নাগাদ দেশের অভ্যন্তরে এনডব্লিউডি সার্কিট ২৩,১৮৫টি (১৯৯৭ সালে ছিল ১১,৪১০টি) এবং বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ সার্কিট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। এর থেকেই বোঝা যায়, কত দ্রুত এ-ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে।
- ৪০টি জেলাকে ডিজিটাল টেলিফোনের আওতায় এবং ১৭৫টি উপজেলায় ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়।
- ২০০১ সালের শেষ নাগাদ টিএন্ডটি-র ৭ লক্ষ এবং বেসরকারি মোবাইল খাতে ৬ লক্ষসহ দেশে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।
- চীনের সহায়তায় প্রতি জেলা সদরে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ডিজিটাল টেলিফোন স্থাপনের কাজ অগ্রসর করে নেয়া হয়।
- অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট ফোন চালু করা হয়েছে।
- ভি-স্যাটের সাথে ডাটা প্রদান সহজ হওয়ায় কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি ও সফট্ওয়্যার রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত হয়।
- পুরনো ঢাকার টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে ৬৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭৫০০ লাইনের একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উদ্বোধন করা হয়।

- ১৯৯৮ সালের জুন পর্যন্ত সারা দেশে ১৪০৩টি কার্ড ফোন বুথ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতে বেসরকারি খাতেও কার্ড বুথ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমবারের মতো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর চালু করে। এ-ছাড়াও বহুসংখ্যক নতুন ডাকঘর স্থাপন করা হয়।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বগুড়াসহ আরো কয়েকটি জেলায় বাংলাদেশ টি অ্যান্ড টি বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্র ও ডাটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উল্লিখিত জেলাসমূহের গ্রাহকবৃন্দ ইন্টারনেট, ডিডিএন এবং ডাটা নেটওয়ার্কের সুবিধাদি ভোগ করছেন।
- ডাক বিভাগের কাউন্টার সার্ভিসের আধুনিকায়ন ও জনসাধারণকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ডাক বিভাগকে কম্পিউটারাইজড করা হয়।
- দেশের ৪০টি শহরে প্রধান ডাকঘর ও ডিজিএমজি-দের অফিসের প্রয়োজনীয় জায়গা ও ডাকসেবার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।
- ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন করা হয়।
- ১১৪টি উপজেলায় পোস্ট অফিস ও পোস্ট মাস্টারের বাসভবন নির্মাণ করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার ২৬৯টি গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ করে।
- মুজিবনগর কমপ্লেক্সে ডাকঘর নির্মাণের কাজ অগ্রসর করে নেয়া হতে থাকে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের জন্য অটোমেটিক লেটার কাটিং মেশিন সংগ্রহ, গ্রামীণ ডাক সার্ভিসের উন্নয়ন, জেলা সদর ও বিভাগীয় ডাকঘর নির্মাণ এবং ডাক বিভাগের মোবাইল ভ্যানসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন ছিল।

২০. ক্রীড়া জগতে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য

- বর্তমান সময়ের উপযোগী করে জাতীয় ক্রীড়া নীতি ঘোষণা করা হয়।
- দীর্ঘদিন পর ক্রীড়া পরিষদ ক্রীড়া উন্নয়নের স্বার্থে মোট ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।
- ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দল প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে।
- চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে ছিল।

- দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবসমূহে বিপুল পরিমাণ ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়।
- দেশের সকল জেলায় প্রতি বছর ১২টি ক্রীড়া কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালিত হতে থাকে।
- ১৯৯৯ সালে নর্থ ক্যারোলিনায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড গেমসে ২১টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের মাধ্যমে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।
- ১৯৯৯ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সপ্তাহে ২০০০ সালে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এশিয়া কাপ ক্রিকেট সমাপ্ত হয়।
- ২০০০ সালের ২৬ জুন ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা লাভ করে।
- ঢাকা মহানগরীর অদূরে ২টি স্টেডিয়ামসহ মোট ৪টি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণের কজ শুরু করা হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্রিকেটের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ আইসিসি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।
- ১৯৯৬ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত পেপসি এসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়।
- ১৯৯৮ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত এসিসি ক্রিকেট ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়।
- অনূর্ধ্ব উনিশ এশীয় যুব ক্রিকেটে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।
- ১৯৯৭-৯৮ সালে অল ইন্ডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে (অনূর্ধ্ব-১৩) বাংলাদেশ দু'বার চ্যাম্পিয়ন হয়।
- ১৯৯৮ সালে ঢাকায় উইলস নক আউট ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট (মিনি বিশ্বকাপ) টুর্নামেন্টের সফল আয়োজন করা হয়।
- নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসের ফুটবলে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পদক জয় করে।
- ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফুটবলে বাংলাদেশ প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়।

- আওয়ামী লীগ সরকার ক্রীড়ায় সাফল্য অর্জনকারীদের জন্য নানা উৎসাহব্যঞ্জক সংবর্ধনা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে।
- আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ ক্রীড়াবিদ কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সারা দেশের ৫১০ জন দুস্থ ও উদীয়মান ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
- ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান কার্যক্রম চালু করে।

২১. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : মুক্তধারার আবাহন

- একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরব অর্জন জাতির জীবনে এক অনন্য ঘটনা।
- সকল জেলায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬টি জেলা ও ৬টি থানায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পকলা একাডেমী স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- অবশিষ্ট ২৭টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমী স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- জেলা পর্যায় ও বিভাগীয় শহরে পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়।
- খুলনায় নতুন বিভাগীয় জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়।
- ঔপনিবেশিক আমলের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ১৮৭৬ বাতিল করা হয়।
- বাংলা একাডেমী চত্বরে একুশে ভবন নির্মাণ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণা ও প্রকাশনার জন্য দুটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ঢাকায় 'সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক বলয়' গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়।
- বাংলাদেশের লুপ্ত ও পরিবর্তনশীল লোক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ঐতিহাসিক সোনারগাঁওয়ে জাদুঘর উদ্বোধন করে। দেশের দুস্থ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাসিক ভাতা বাড়িয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা করা হয়।
- প্রায় ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় চিত্রশালা ও নাট্যশালার নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনকের সমাধিস্থলে সৌধ নির্মিত হয়।
- মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান এবং তাঁর স্মৃতি বিজড়িত যশোরের সাগরদাঁড়িতে মধুপল্লী স্থাপনের কাজ আওয়ামী লীগ সরকার সফলভাবে বাস্তবায়ন করে।

- কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে।
- রংপুর জেলার পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।
- কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন একাডেমী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ অগ্রসর হতে থাকে।
- সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়।

২১.২ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখা

- ঐতিহাসিক মুজিব নগরে 'মুজিব নগর' কমপ্লেক্স স্থাপন করার কাজ শুরু করা হয়।
- ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন ও স্বাধীনতাস্তম্ভ নির্মাণের কাজ অনেক দূর এগিয়ে যায়।
- ঢাকার রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২২. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের গৌরব ও মর্যাদার আসন

- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পররাষ্ট্র নীতিতে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়। সরকার মূলত উন্নয়নের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক কূটনীতির আলোকে কার্যকর ও যুগোপযোগী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে।
- ভারতের সাথে সম্পাদিত ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত স্থলচুক্তি বিশ্ব-সমাজের কাছে প্রশংসিত হয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নৃ-জাতিগত সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।
- আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাগ্রগণ্য অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে : প্রথমত, বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ, দ্বিতীয়ত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্রে সফর।
- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। এসব ফোরামে আমাদের ভূমিকা বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনে বিরল সম্মান। ফোরামগুলো হচ্ছে :

- নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও ওয়াশিংটনে মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলন;
- রোমে বিশ্বখাদ্য শীর্ষ সম্মেলন ও ভারতে আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন সম্মেলন;
- পকিস্তানে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন ও জার্মানিতে পঞ্চম বিশ্ব বয়স্ক সম্মেলন মালদ্বীপে নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ও ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন;
- ইরানে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন ও ঢাকায় ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন;
- ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন ও জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন।

♦ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সর্বাধিক সংখ্যক রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের বিদেশী অতিথি বাংলাদেশ সফর করেন।

♦ ভারত ও পাকিস্তান– এই দুই দেশের পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় অবস্থান ও ভূমিকা আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র নীতির এক বিরাট সাফল্য। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই সময়ে ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। উত্তেজনা প্রশমনে তিনি যে ভূমিকা রাখেন, তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।

♦ দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি-- সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

♦ শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে সাহায্য প্রাপ্তি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের পরিচায়ক।

♦ আওয়ামী লীগ সরকার ২০০১ সালে ঢাকায় জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিল।

♦ বাংলাদেশের জন্য লাভজনক ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যমণ্ডিত ন্যাম সম্মেলনের যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিল। চীনের আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নামে একটি সর্বাধুনিক বৃহৎ মিলনায়তন। বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ন্যাম সম্মেলন বাতিল করে। ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

♦ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমন্বয়কারীর মর্যাদা লাভ।

♦ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বিমসটেক আঞ্চলিক ফোরাম গঠন।

- ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও সাবেক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে ইতালির জেনোয়ায় অনুষ্ঠিত জি-৮ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে স্বল্পোন্নত বিশ্বের এশীয় মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২২ জুলাই জি-৮ সম্মেলনে শেখ হাসিনার অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদাবাহী সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।
- আওয়ামী লীগ সরকার শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা দেশে-বিদেশে সর্বত্রই প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন, মানবাধিকার ও শান্তি সংরক্ষণ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন, কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, ভারতের সাথে পানিচুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সর্বোপরি, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি কাজে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ উদ্যোগ, তৎপরতা ও দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়। এসব কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নানাভাবে দেশকে সম্মাননা জানিয়েছে, তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকে প্রদত্ত ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার, বিশ্বখাদ্য সংস্থার সেরেস পদক দান ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে বাঙালি জাতিকেই অভূতপূর্ব গৌরব ও মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছে।